গোপন মৃত্যু ও নবজীবন

[দ্বিতীয় খণ্ড]

এস. এম. জাকির হুসাইন

গোপন মৃত্যু
ও
নবজীবন

(২য় খণ্ড)

এস. এম. জাফির হুসাইন

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২—ক, বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০
ফোন ঃ ৭১১৮৪৪৩

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ২০০৩
পুনঃ মুদ্রণ ঃ জুলাই, ২০১৪

প্রকাশক
শরীফ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
☎: ৭১১৮৪৪৩, ৮১১২৪৪১

© গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
এস. এম. মামুন

কম্পোজ
Paradigm Computers
Khilgaon, Dhaka-1219

মুদ্রণ
নোভা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
১৫/বি, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোনঃ ৯৬৬৭৯১৯

মূল্য: ১০০.০০ টাকা মাত্র
Price: Tk. 100 only

GOPON MRITYU O NABOJIBON (Part-2)
(Secret Death and Ressurrection)
By—S.M. ZAKIR HUSSAIN
GYANKOSH PROKASHONI
38/2,Kaw, BANGLABAZAR, DHAKA 1100

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার স্কুল জীবনের প্রিয় শিক্ষক:

জনাব মোঃ শাহজাহান শেখ

বি. এল. জে. উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি আমাকে ছোটবেলায় এত বড় ক'রে দেখেছিলেন যে আজ আমি নিজেকে ছোট ক'রে দেখার যোগ্যতা পেয়েছি। আমি তাঁর ইহকাল ও পরকালের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
এক	বিস্মৃতির মূল্য	০১
দুই	সম্মিলিত নির্জনতা	০৮
তিন	মুখোমুখি উল্টোমুখ	১১
চার	ছায়ার অন্ধকার	২২
পাঁচ	একত্বের খেসারত	২৫
ছয়	বন্ধনের চিত্র	৩২
সাত	মুক্তির প্রথম ফর্মুলা	৪৫
আট	মুক্তির ভয় এবং ভয়ের মুক্তি	৬৮
নয়	বদ্ধ ঘরে বাইরের বাতাস	৯০
দশ	আম যার ঝুড়িও তার	৯২
এগার	দয়ার ধ্বংসাত্মক শক্তি	৯৪
বার	দুঃখের দান	১০৭
তের	নাম বদল	১১১
চৌদ্দ	সূর্যের ছায়া	১১২

www.pathagar.com

এক. বিস্মৃতির মূল্য

বুড্ডা অধ্যাপক সন্দেহবিদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে ঢুকে প'ড়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রেই আপন মনে বই প'ড়তে থাকলেন। মিনিট পাঁচেক পর বুড্ডা বলল, 'স্যার, অনুমতি না নিয়েই ঢুকে পড়েছি।'

'তাহলে অনুমতি না নিয়ে বের হয়ে যাও, ' বই থেকে চোখ না তুলেই তিনি আদেশ করলেন।

বুড্ডা বলল, 'কিন্তু স্যার, এখন গেলে তো বিনা অনুমতিতে যাওয়া হলো না। কারণ অনুমতি যে নেয়ার দরকার নেই, সেই অনুমতিই তো আপনি দিয়ে রেখেছেন।'

অধ্যাপক সন্দেহবিদ তার দিকে তাকালেন। 'আমি কী বলব তা তুমি আগে থেকে চিন্তা ক'রে রেখেছিলে?'

'জ্বী। আমি জানতাম আপনার কাছে আসলে আমার চিন্তাভাবনা সব গুলিয়ে যাবে। কোনো অধ্যাপকের কাছে আসতে হলে আগে থেকে চিন্তাভাবনা ক'রে আসতে হয়। গুরুজী আমাকে একথা শিখিয়ে তারপর এখানে পাঠিয়েছেন।'

'হুম্। একা আসনি কেন?'

'মাথার মধ্যে গোলমাল, মনের মধ্যে কোলাহল। আলপিনের আগা কিংবা কুতুবমিনারের চূড়া কিংবা চাঁদনি রাতের তালগাছের মতো একা হওয়ার মতো সৌভাগ্য আজও হলো না, স্যার।'

'হুম্। ব্যবসা ভালো হচ্ছে না। চোখে কী?'

'সন্দেহ।'

'ধুয়ে এস।'

'আশা করি আপনার কাছে মলম আছে। ক্ষত হয়ে গেছে।'

'লুকিয়ে আসনি কেন?'

'দরজায় কাউকে দেখলাম না। তাই ভাবলাম পোশাক প'রেই ঢুকে পড়ি।'

'বেশ করেছ। যাবার সময়ে গোপনে যেও। সাধনার এবং সফলতার প্রথম শর্ত হলো হিজরত বা পলায়ন। তা ঘটে সত্যকে পাবার বা তার সন্ধান পাবার

www.pathagar.com

পরে, আগে নয়। ভিন্ন ভিন্ন নবী ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হিজরত করেছিলেন। গোপন পথ না পেলে কখনও পালাতে নেই।'

> মূসা বলল, 'যখন আমি পথভ্রষ্ট ছিলাম তখন আমি ঐ কাজটা করেছিলাম। তারপর যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তখন তোমাদের কাছ থেকে *পালিয়ে গেলাম*। তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন আর আমাকে রসূলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (সূরাঃ শোআরা, ২০-২১)

> (আমি বলেছিলাম,) 'তুমি আমার দাসদেরকে নিয়ে রাত্রে বের হয়ে পড়ো। তোমাদের পিছু নেয়া হবে।' (সূরাঃ দুখান, ২৩)

'স্যার, আপনার এখানে কিছু শিখতে আসিনি।'

'আরো খুশি হলাম।'

'আমি জানতাম কথাটায় আপনি অপমানিত বোধ করবেন না।'

'কেউ যখন আমার কাছে অনেক কষ্ট ক'রে শেখা জ্ঞান ভুলে যেতে আসে, তখন আমি বেশি খুশি হই।'

'ঢাকা শহরে এরকম ব্যক্তি আছেন জানলে নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানার্জন করতাম। পুরো মাথাটা লোড ক'রে ফেলতাম। কিছু কিছু জ্ঞান ক্ষতি করবে ভয়ে ইচ্ছে ক'রেই শিখিনি।'

'বেশি কথা কবে থেকে ব'লে আসছ?'

'যখন থেকে সন্দেহ করতে শিখেছি। অবসরে নিজের সাথে নিজে কথা বলি। তার পরও সন্দেহ দূর হয় না।'

'সন্দেহ করতে কেউ শেখে না। সন্দেহ মানব ও জ্বিনের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ সন্দেহকে প্রকাশ করতে শেখে মাত্র।'

'কিন্তু আমি যে জানতাম জ্ঞানী মানুষের সন্দেহ বেশি।'

'তা সত্য।'

'তার মানে কি এই নয় যে জ্ঞানই সন্দেহ সৃষ্টি করে?'

'কোনো ভালো গাধাও একথা বলবে না। মানুষের এই ভ্রান্ত ধারণার কারণে অনেকে জ্ঞানার্জনও করতে ভয় পায়। আমাদের দেশের বিভ্রান্ত মোল্লারা তো জ্ঞানার্জনকে অনেক ক্ষেত্রে হারাম মনে করে। অথচ রসূল (সঃ) জ্ঞানার্জনের জন্য চীনদেশেও যেতে বলেছিলেন। তিনি যখনকার চীনের কথা বলেছিলেন, তখনকার চীনে কী ইসলাম ছিল? ব্রিটিশ স্টাইলে প্রতিষ্ঠিত আলীয়া মাদ্রাসা ছিল? ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল? সেখানে কোনো ফেকাহশাস্ত্রবিদ বা আল্লাহ্‌র অলি ছিলেন?'

'স্যার, আমি এত বোকা নই যে আপনার প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করব।'

www.pathagar.com

'সন্দেহ আমার কাছে একটা প্রিয় বস্তু।'

বুড্ডা চোখ বড় বড় ক'রে তাঁর দিকে তাকাল।

তিনি ব'লে চললেন—'আমি তাকে পছন্দ করি না যার কোনো সন্দেহ নেই আবার জ্ঞানও নেই।'

'জানতাম না।'

'আমি তাকে পছন্দ করি না যার সন্দেহ আছে কিন্তু জানার ইচ্ছা নেই।'

'আমিও না।'

'আমি তাকে পছন্দ করি না যে সন্দেহ সৃষ্টি হবে ভয়ে জ্ঞানার্জন করে না এবং এভাবে শ্রেষ্ঠতম ফরজ কাজ থেকে দূরে থাকে। আফগানিস্তান ধ্বংস হওয়ার একটা বড় কারণ হলো এই যে দেশটা জ্ঞানকে ভালোবাসেনি। সন্দেহের রহস্য না জেনে তাকে জোরপূর্বক ধামাচাপা দিতে গিয়ে মোল্লারা হয়ে যায় কট্টর মৌলবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, নিষ্ঠুর, খিটখিটে মেজাজের। এভাবে অনেকে কুৎসিত যৌনতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। যৌবনের এটম বোমাকে তারা কেবল পোশাকের নিচে চাপা দিয়ে রাখে, মারেফত দিলে গলিয়ে তা থেকে খুসবু সৃষ্টি করে না। ফলে অসময়ে হঠাৎ ক'রে হাঁটে হাড়ি ভেঙ্গে যায়। এটম বোমা ভুল জায়গায় বার্স্ট হয়ে পড়ে। ঠিক যেমন ভুল জায়গায় বার্স্ট হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম এটম বোমা—হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে। সেখানে এমন কিছু ছিল না যা এটম বোমা দিয়ে ধ্বংস করতে হবে। আবার যুদ্ধের যে পর্যায়ে সে-সব জায়গায় বোমা ফেলা হয়েছিল, সেই পর্যায়ে বোমা তো দূরের কথা, ইট-পাটকেল মারারও দরকার ছিল না। বিভ্রান্ত যৌনতাপাগল মোল্লাদের অবস্থা যুদ্ধ-ত্রস্ত মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মতো। অনেকে আবার মোনাফেকির দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসতে পারে না।'

'তবুও নিজের সন্দেহ নিয়ে আমার ভয় আছে।'

'আমি সন্দেহকে ভালোবাসি।'

'দ্বিতীয়বার বললেন, স্যার।'

'নবীগণ বাদে অন্যদের মধ্যে যার সন্দেহ নেই কিন্তু জ্ঞানার্জনের স্পৃহাও নেই, তারা নামানুষ, যদি তারা সঠিক উপায়ে বিশ্বাসী না হয়।'

'স্যার, মনে হচ্ছে জ্ঞানের কথা হঠাৎ ক'রে শুনছি।'

'আমার কাছে গোটা মহাবিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হলো সন্দেহ।'

বুড্ডা এক পা পিছোলো।

'যে আমার কাছে সন্দেহপূর্ণ তৃষ্ণা নিয়ে আসে না, আমি তাকে তাড়িয়ে দেই।'

বুড্ডা আশ্বস্ত হলো।

'যে আমার কাছে সন্দেহকে গোপন রেখে মুখে বলে যে সে বিশ্বাসী, আমি তাকে একটা কুৎসিত নাম দেই।'

www.pathagar.com

বুড্ডা হেসে উঠল।

'গোটা মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়েছিল একমাত্র সন্দেহকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে।'

বুড্ডা আরেক পা পিছোল।

'বিশ্বাসের একমাত্র ভিত্তি হলো সন্দেহ।'

বুড্ডা ব'সে পড়ল।

'মাথায় হাত দাও।'

সে মাথায় হাত দিল।

'জ্ঞানহীন বিশ্বাস হলো প্রতিষ্ঠিত অজ্ঞতা।'

বুড্ডা নিজের কপাল চেপে ধরল।

'যার সন্দেহ করার স্বভাবগত তাগিদ নেই, একমাত্র তার জন্য জ্ঞানার্জনের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তার অজ্ঞতার কারণেই সম্মানিত।'

বুড্ডা দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরল।

'সন্দেহ হলো একটা তৃষ্ণার্ত স্পঞ্জের টুকরো। তাকে জ্ঞানের সমুদ্রে ডুবিয়ে নিলে তা যে রূপ লাভ করে, তাকে বলে ইমান।'

বুড্ডা এক চোখ বড় ক'রে তাকিয়ে পড়ল।

'সেই পানি তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে পান ক'রে যে বেশি বেশি তৃষ্ণা প্রাপ্ত হয়, তার নাম আরেফ।'

এবার বুড্ডা চোখ বন্ধ করল।

প্রফেসর সন্দেহবিদ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বুড্ডার কাছে এক-পা এগিয়ে গিয়ে ছুরির মতো ধারালো চোখে তার দিকে তাকালেন—'অনুমতি না নিয়েই বসে পড়েছ।'

'জ্বী, শুয়ে পড়িনি।'

'নিশ্চয়ই সব ভুলে গেছ যা জানতে।'

'ফিফটি পার্সেন্ট।'

'গুড! মৃত্যুর পূর্বশর্ত হলো ওসব আবর্জনা ভুলে যাওয়া। আল্লাহ্ প্রিয়তম নিজেই মৃত্যুর আগে রোগ ব্যাধি দিয়ে মানুষকে তার পুরোনো জ্ঞান ভুলিয়ে দেন:

www.pathagar.com

> হে মানবজাতি! পুনরুত্থান সম্বন্ধে তোমাদের সন্দেহ (আছে)! (তাহলে জেনে রাখ) আমি তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর আংশিক আকারপ্রাপ্ত ও আংশিক আকারহীন চর্বিতপ্রতিম মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে আমার শক্তি প্রকাশ করার জন্য। আমি যা ইচ্ছা করি তা আমি এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দেই। তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে তোমরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারও কারও মৃত্যু ঘটবে আবার কেউ-কেউ বয়সের শেষপ্রান্তে পৌঁছবে, ***সবকিছু জানার পরও তার কোনো জ্ঞান থাকবে না।***
>
> (সূরাঃ হজ, ৫)

'আগে জানতাম মৃত্যু মানে শুধু নফসের মৃত্যু।'

'ভুল জানতে। তুমি কি চাও না এই ভুল জ্ঞানের মৃত্যু হোক? তাহলে কি আল্লাহ্ নিজেই ভুল বলেছেন?'

'সাহস থাকলেও তাঁকে দোষ দিতাম না। কারণ তাঁর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হলেও তা দিয়ে তাঁর কোনো ক্ষতি করা যায় না।'

'মৃত্যু মানে নফসের মৃত্যু। সত্য। কিন্তু **তোমার জ্ঞান তো তোমার নফস ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি তো আজীবন তোমার যুক্তিকে তোমার স্বভাবের পক্ষে ব্যবহার করেছ।** ঠিক নারীর মতো। একে বলে র‍্যাশনালাইজেশন, যার খারাপ ও ভালো দু'রকমের অর্থ রয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে রাজনীতিবিদরা এই জঘণ্য স্বভাবটাকে প্রয়োগ করে বেশি। পবিত্র কোরআনে আছে যে ইহকালে মোনাফেকরা এবং ক্ষতিগ্রস্তরা পরকালেও নিজেদের স্বভাবের পক্ষে র‍্যাশনালাইজ করবে:

> আর তুমি ওদেরকে প্রশ্ন করলে ওরা নিশ্চয় বলবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়াকৌতুক করছিলাম।' বলো, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রসুলকে ঠাট্টা করছিলে?' **তোমরা দোষ ঢাকার চেষ্টা করো না।** তোমরা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করেছ। তোমাদের মধ্যে কাউকে আমি ক্ষমা করলেও অন্যদেরকে শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধ করেছে। (সূরাঃ তওবা, ৬৫-৬৬)

> যাদের মৃত্যু ঘটায় ফেরেশতারা তারা নিজেদের ওপর জুলুম করতে থাকা অবস্থায়। তারপর ওরা আত্মসমর্পণ ক'রে (সাফাই গেয়ে) বলবে, **'আমরা তো কোনো খারাপ কাজ করিনি।'** হ্যাঁ, তোমরা যা করেছিলে তা আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন।
>
> (সূরাঃ নাহ্ল, ২৮)

www.pathagar.com

সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে! এ এমন এক দিন যেদিন কারও মুখে কথা ফুটবে না, আর **কাউকে দোষক্ষালনের অনুমতি দেওয়া হবে না।** (সূরাঃ মুরসালাত, ৩৪-৩৬)

'এভাবে আগে কখনও ভাবিনি।'

'কারণ আগে তুমি ভাবইনি। স্বভাবকে প্রয়োগ করেছ মাত্র। সঠিকভাবে চিন্তা করার দুটো পদ্ধতি আছে—ডিডাকটিভ ও ইন্‌ডাকটিভ। প্রথম পদ্ধতিতে একটা বৃহত্তর সত্য থেকে বিশেষ তথ্যকে উদ্ভাবন করা হয়। যেমন:

মানুষ মরণশীল।
দবির মানুষ।
সুতরাং দবির মরণশীল।

এখানে ডিডাকটিভ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অপরপক্ষে:

দবির একজন মানুষ।
সে মরেছে।
এই পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে তারা সবাই মরেছে।
সুতরাং মানুষ মরণশীল।

এই পদ্ধতি হলো ইন্‌ডাকটিভ পদ্ধতি, কারণ এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানা তথ্য থেকে বৃহত্তর এবং পূর্ণাঙ্গ একটা অজানা সত্যকে উদ্ঘাটন করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিটা হলো প্রকৃতি থেকে জ্ঞানার্জনের একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। আর প্রথমটা হলো প্রমাণিত সত্যকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য এবং একাধিক তত্ত্বকে বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে সমন্বিত করার জন্য বিশেষ উপযোগী। উভয় পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা আছে। সেসব দিকে খেয়াল রেখে সেগুলোকে নিরাপদে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু তুমি যদি কোনোরূপ তথ্যপ্রমাণের সাহায্য ছাড়া কেবল তোমার স্বভাবের পক্ষে যুক্তিকে ব্যবহার ক'রে কিছু সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে যে জ্ঞান অর্জন করবে, তা হবে মোনাফেকি বা অনুমান। পবিত্র কোরআনে প্রিয়তম এজন্য আমাদের যুক্তির ওপর প্রশ্ন ছুড়ে মেরেছেন: —তোমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত ক'রে থাক?'

'স্যার , আমার স্মৃতিশক্তিটা ভালোভাবে কাজ করছে না।'

'আই লাভ ইট্! তোমাকে মারতে তেমন বেগ পেতে হবে না দেখছি।'

'আমি এও জানতাম যে হঠাৎ মৃত্যু আমার কপালে জুটবে না, আমাকে একটু একটু ক'রেই মরতে হবে।'

www.pathagar.com

'গুরুজী আবার কবে ফিরে যেতে বলেছেন?'
'আপনি যখন তাড়িয়ে দেবেন।'

'সন্দেহমুক্ত না ক'রে আমি কাউকে তাড়াই না।'

'এজন্যই আপনার কাছে কেউ আসতে চায় না।'

'ঠিক বলেছ। কেউ জানতে চাইল না তাকে সন্দেহটা কেন দেয়া হয়েছিল। সবাই কেবল সন্দেহটাকে রংচং মাখিয়ে ফিলোসফি আর লিটারেচারের বুলি আউড়িয়ে ব্যবসা করতে চায়।'

'সন্দেহটা আমারও মূল্যবাণ সম্পত্তি।'

'ভয় নেই। ফিক্‌স্‌ট্‌ ডিপোজিটে রেখে দেব। আজীবন সুদ পাবে।'

www.pathagar.com

দুই. সম্মিলিত নির্জনতা

অধ্যাপক বললেন—'চল, আমার বাসায়।'

বুড্ডা ইতস্তত করতে লাগল। তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে অধ্যাপক বললেন—'এক বাসায় একা থাকি।'

'বুড্ডা তাঁর কথাটা ঠিকমতো বুঝে উঠতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল—'স্যার, একজন মানুষ কয়টা বাসায় একা থাকে?'

'অধিকাংশ মানুষ যখন নির্জনে থাকে তখন একা থাকে না, আবার তারা যখন সমাজে থাকে তখন একা থাকে।'

'অর্ধেক বুঝেছি, স্যার।'

'কারণ তোমার যে একাকিত্ব, তা অর্ধেক একাকিত্ব; আর তোমার যে সমাজ, তাও অর্ধেক সমাজ।'

'কারণ আমি এখন ফিফ্‌টি পার্সেন্ট বুড্ডা। আপনি তো আমার মাথা থেকে অর্ধেক জ্ঞানই কেড়ে নিয়েছেন।'

'মাথাটা ঝালাই করেছ কখনও?'

'কয়েক গুরুর হাতে ব্রেইনওয়াশ হয়েছিলাম।'

'ও, তাই বল। রিকণ্ডিশণ্ড মাথা! তার ওপর তো আবার দিব্যি হোয়াইটওয়াশ ক'রে রেখেছ। চুলগুলো তো বেশ ফিটফাট।'

বুড্ডা মাথা নিচু করল। অধ্যাপক বললেন—'ভেতরে চল। তুমি ক্ষুধার্ত।'

তারা ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। সত্যি সত্যিই অধ্যাপক এ বাসায় একা থাকেন। সাথে আছে তাঁর সাহায্যকারী একজন লোক। সে তাদেরকে নাস্তা এনে দিল। তারা দু'জন নাস্তা করলেন।

নাস্তা শেষে বুড্ডা জিজ্ঞাসা করল—'আপনার ছেলেমেয়ে নিশ্চয়ই আছে, স্যার?'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, একটা বিয়ে করেছিলাম সেই সাতাশ বছর আগে।'

'তারপর?'

'এখনও আছে।'

বুড্ডা হাফ ছাড়ল।

তিনি বলে চললেন—'তার ঘরে চার সন্তান।'

'তারাও এখনও আছে, স্যার?'

'একজন এখন নেই। ওকে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে গুরুজীর কাছে পাঠিয়েছিলাম। তিনি ওকে হত্যা করেছেন।'

'আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ!'

'আরো একজন নেই। ওকে বিয়ে দিয়েছিলাম। ওরই পছন্দ করা মেয়ে। সংসারে তৃপ্তি পাচ্ছে না। ও এখন একটা ভারতীয় গান বেশি শোনে যার প্রথম কলিটা হলো—আমি নেই, আমি নেই.....। ইদানিং একটা ব্যান্ড সঙ্গীত শুনছে দেখছি—আমি একাকী, একাকী, একাকী.....। অর্থাৎ সে তিন বেলাই একাকী।'

'খুব দুঃখজনক, স্যার।'

'ছোট মেয়েটাও নেই।'

'বিয়ে হয়ে গেছে?'

'না।'

'তাহলে?'

'পালিয়েও যায়নি।'

'তাহলে?'

'কলেজে পড়ে। তোমার মতো ফিফ্‌টি পার্সেন্ট।'

'এত সহজে বললে বুঝতে পারব না, স্যার।'

'মারাত্মক সুন্দরী।'

বুড্ডা চুপ ক'রে রইল।

অধ্যাপক বলতে থাকলেন—'প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করে—আমি এত সুন্দর কেন? আমি বলি—এটা তো আল্লাহ্‌র রহমত, মা। কিন্তু সে বলে—এতে তো আমার সমস্যা হচ্ছে।

—কী সমস্যা, মা?

—বেশি পড়ালেখা করতে ইচ্ছে করে না। বেশি নিঃস্বার্থ হতে পারি না। অন্যান্য মেয়েদের কাছ থেকে বেশি প্রশংসা আশা করি। না পেলে বেশি খুশি থাকতে পারি না। নিজেকে বেশি ঢেকে রাখতে ইচ্ছে করে না। গা পুড়ে যায়। আবার আল্লাহ্‌র বিধানও মানতে হয়। এদিকে আবার একটু ঘোরাফেরা করারও উপায় নেই। অধিকাংশ মানুষই নিয়ন্ত্রণহীন, পশু।

www.pathagar.com

—ঠিক বলেছ, মা। আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটা নেয়ামতের সাথে তা রক্ষার দায়িত্ববোধটাও তিনি নেয়ামতভোগীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। এই দায়িত্বটাই বড় কষ্টের।

আমার কথা শুনে সে হাতের চায়ের কাপটা আছাড় মেরে ফেলে দিল। তা গিয়ে পড়ল খাটের তলে। কাজের বুয়াটা দৌড়ে এসে দেখে যে তা ভাঙ্গেনি। তাই সে কাপ-পিরিচটাকে আবার এগিয়ে দিয়ে বলল—ভাঙ্গে নাই, আপা। এই নেন, আবার ভাঙ্গেন। সে বলল—নিয়ে যাও। আমার রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। আমি বললাম—এই তো সুন্দর কথা বলেছ, মা। না ভাঙলে ভাঙতে নেই। তুমি এখন ঘুমোও গিয়ে। অর্ধেক ঘুমাব—ব'লে সে না-ঘুমানোর জন্য তার রুমে চ'লে গেল।'

'স্যার, আপনি কি ফ্যামিলির সাথে থাকেন না?'

'পড়াশুনার সময়ে এখানে থাকি। এখানে ছাত্র-ছাত্রী বন্ধুবান্ধব আসে। ধর্মপ্রচারের কাজটা এখানেই করি। রাতে বাসায় ফিরে যাই।'

'ঢাকা শহরে থাকতে আমার খুব কষ্ট হবে। গাছ-পালা-মাটি-পানি কিছু নেই তো।'

'এরকম কষ্ট আমারও হয়। দাঁত কিড়মিড় ক'রে দায়িত্ব পালনের জন্য প'ড়ে থাকি।'

'স্যার, এখানে তো বাতাসও নেই। খালি ধুলো আর ধোঁয়া।'

'তোমাকে বেশিদিন আটকে রাখব না। মাগরিবের নামাজের পর তোমার অপারেশন শুরু করব, ইনশাল্লাহ।'

www.pathagar.com

তিন. মুখোমুখি উল্টোমুখ

মাগরিবের নামাজের পর বুড্ডা অধ্যাপকের মুখোমুখি ব'সে আছে। অধ্যাপক সন্দেহবিদ তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কি অদ্ভুত, তাই না?'

'জ্বী। পুরোপুরি ব্যক্তিগত ব্যাপার। এজন্য আজীবন মানুষ নিজস্ব কায়দায় কষ্ট পায়। কেউ কারো কষ্টের ভাগ অন্যকে দিতে পারে না।'

'ঠিক বলেছ। এই আমাকে দেখ। তোমারই মতো রক্তমাংসে গড়া একটা মানুষ। তোমারই সামনে চুপচাপ ব'সে আছি। আল্লাহ্ চাইলে আরো দু'ঘণ্টা বসে থাকব।'

'জ্বী, তারপরও আমার মনে হবে আপনি বসেই আছেন। আর কিছু না।'

'তুমি এখন মাত্র ফিফ্‌টি পার্সেন্ট। দু'ঘণ্টা পরও তাই রয়ে যাবে, যদি আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল না হয়।'

'জ্বী। এজন্য আমার ভয় হয়।'

'কি অদ্ভুত! তুমি আমাকে চেন না, অথচ পছন্দ কর। আমি তোমাকে চিনি এবং তুচ্ছ ভাবি।'

'স্যার, মনে হয় আপনার সামনে ব'সে নিজেকে অপমানিত করি।'

'তবুও তো তোমার মনটা আছে। আর তা তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে।'

'ধরতে পারি না।'

'কি অদ্ভুত! তোমারই একজন প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলছেন যে তাঁর নিজের কোনো সন্দেহ নেই। অথচ অন্তত তাঁকে বিশ্বাস ক'রেও তুমি সন্দেহমুক্ত হতে পারলে না। কোরআনে বিশ্বাস কর?'

'জ্বী, করি। আগে না জেনেই বিশ্বাস করতাম। এখন জেনে করি।'

'আল্লাহ্ এক—একথা বিশ্বাস কর?'

'জ্বী। 'শ্রীকৃষ্ণ এক' বললেও বিশ্বাস্ করতাম। স্রষ্টা কখনও একের বেশি হতে পারেন না। আমার সমস্যা ওখানে নয়।'

'মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল—একথা বিশ্বাস কর?'

'তাও করি।'

'তাহলে সমস্যাটা কোথায়?'

www.pathagar.com

'যেই সবকিছু ত্যাগ করতে যাই, অমনি সবকিছুই এলোমেলো হয়ে যায়। এই অসম্পূর্ণতা আমার পছন্দ নয়।'

'সুন্দর বলেছ। তাহলে ভেবে দেখ তো সন্দেহ কত বড় রহস্যময় জিনিস। তোমার সামনে বসে আছে এমন একজন যার কোনো সন্দেহ নেই, অথচ তাকে দিয়ে তোমার কোনো লাভ হলো না। অথচ তুমি বলছ যে তুমি অবিশ্বাসীও নও। এখানেই যত রহস্য। অধিকাংশ অজ্ঞ ধার্মিক মনে করে যে সন্দেহ করে কেবল নাস্তিক এবং মুশরিকরা। না, তা নয়। বিশ্বাসীদের সন্দেহ নিয়েও আল্লাহ্ কোরআনে কঠোর কথা বলেছেন: তিনি বলেছেন যে যারা বিশ্বাস করে এবং আবার অবিশ্বাস করে এবং আবার বিশ্বাস করে এবং আবার অবিশ্বাস করে এবং এভাবে অবিশ্বাসের জন্য মন খোলা রাখে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

আল্লাহ্ মানুষকে দু'টো জিনিস এমন দিয়েছেন যা তার পুরোপুরি ব্যক্তিগত—প্রেম ও সন্দেহ। জ্ঞানও মানুষের ব্যক্তিগত নয়। কারণ তার ভাগ দেয়া যায়। বরং তা ভাগ করলে বেড়েই যায়। বর্তমানের নলেজ ম্যানেজমেন্ট এর যুগে তো জ্ঞানকে দ্রব্যের মতো বিক্রি করা যায়, সৃষ্টি করা যায়, স্থানান্তরিত করা যায়। অথচ সন্দেহ ভাগ করলে তা আরো জটিল হতে থাকে: আল্লাহ্ কোরআনে বিভিন্নভাবে বলেছেন যে যাদের মনে সন্দেহ আছে তারা অন্যদেরকেও সত্য থেকে দূরে রাখে এবং এরা দ্বিবিধ বোঝা বহন করবে (যেমন সূরাঃ সাফফাত, আয়াত ৩২)। প্রেম ব্যক্তিগত ব'লে তার দৈহিক প্রকাশ বা যৌনতা হলো ব্যক্তিগত। অথচ মানুষ আজ তা হাটে বাজারে বিক্রি করছে। ব্যক্তিগত জিনিস চেয়ে নিতে হয়—এটাই ব্যক্তিস্বাধীনতার বিধান। এটাই মানবিকতা। অথচ আজ মানুষ প্রেম আদায় করছে জোরপূর্বক। ধর্ষণ করছে, ফুসলে নিচ্ছে, ব্যর্থ হলে এসিড মারছে।

সন্দেহটা এত ব্যক্তিগত যে কাউকে ধর্মের কথা বলা হলে সে চটজলদি ব'লে দেয়—ও আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অত্যন্ত সহজ এবং পরিচিত অথচ মানব মন ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা সবার চোখ এড়িয়ে যায়। তোমাকে তা বলছি। আমি এখন যদি একজন রিক্শাঅলাকে বলি—ভাই রিকশাঅলা, আমি যে তোমার চেয়ে একাউন্টিং বেশি জানি এবং বুঝি, একথা কি তুমি স্বীকার কর? সে বলবে—'অবশ্যই, স্যার। একথা আমি জোরে চেচামেচি করে স্বীকার করতে রাজি আছি।' —একই প্রশ্ন আমি যদি কোনো মনোবিজ্ঞানীকে করি, তিনিও একই জবাব দেবেন। আমার কোনো পদার্থবিদ বন্ধুও এক বাক্যে সেক্ষেত্রে আমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবেন। একথা স্বীকার করতে কারো আমিত্বে বাধবে না। বরং একথা স্বীকার না করাটাকেই তাদের দৃষ্টিতে নিচু কাজ ব'লে মনে হবে, কারণ তারা জানেন যে একাউন্টিং-এর ওপর আমার উঁচু ডিগ্রী আছে, যদিও পেশায় আমি গণিতবিদ। কিন্তু একটা প্রশ্ন যদি একজন ফকিরকে, রিকশাঅলাকে, বিজ্ঞানীকে, রাজনীতিককে, এবং আলেমকেও

www.pathagar.com

করি—ভাই গো, আপনি কি একথা স্বীকার করেন যে আল্লাহ্ এবং সত্যের ব্যাপারে আমি যা জানি তা আপনাদের জ্ঞানের চেয়ে বেশি সঠিক?—তাহলে তারা সবাই চোখ সরু ক'রে আমার দিকে তাকাবে। ভাববে যে আমি হলাম পৃথিবীর সবচেয়ে গোঁয়ার এবং অহংকারী মানুষ। কারণ কী? কারণ, **ধর্মের প্রসঙ্গটা সরাসরি মানুষের আমিত্বের সাথে জড়িত, ব্যক্তিস্বাধীনতার সাথে জড়িত। সেক্ষেত্রে একজন ভিক্ষুকও ব্যক্তিত্ব-সচেতন হয়ে ওঠে**। এ নিয়ে আমি রিসার্সও করেছি এবং দেখেছি যে ব্যাপারটা আসলেই তাই। স্বাধীনতা তো ব্যক্তিগতই হবে, নয় কি? তা না হলে আর স্বাধীনতার অর্থ থাকল কী? আল্লাহ্ মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে পুরোপুরি স্বাধীন ক'রে দিয়েছেন:

> তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই বিশ্বাস করত। তাহলে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে? (সূরাঃ ইউনুস, ৯৯)

কত বড় স্বাধীনতা! যার কারণে কাউকে জোর ক'রে ধর্মের মধ্যেও আনা যাবে না।'

'কিন্তু, স্যার, সন্দেহের সাথে স্বাধীনতার সম্পর্ক কী?'

'তুমি যে স্বাধীনতা ভোগ করছ, তারই মূল্য বা খেসারত হলো সন্দেহ।'

'মাই গড! তার মানে?'

'তুমি বলছ—আমি স্বাধীন। যত জোরে সোরে তা বলছ, তত 'আমি' শব্দটা দিয়ে তুমি কাকে বুঝাচ্ছ তা ভুলে যাচ্ছ। তোমার দেখা দিচ্ছে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস বা ব্যক্তিত্বের সংকট।'

'আসলে হয়েছেও তো তাই।'

'এবং নকলকে আসল মনে করছ ব'লে আসলকে ক্রমে ক্রমে বেশি নকল মনে হচ্ছে। যাক সে কথা। এখন সন্দেহের আসল রহস্যে ঢুকে পড়ি।' প্রফেসর হাঁক পাড়লেন—'দুলাল! **হঠাৎ ক'রে** চা নিয়ে আয়।'

দুলাল দৌড়ে এসে বলল—'স্যার, হলি অটাৎ ক'রেই হয়ে যাবেনে। তার আগ পর্যন্ত এট্টু দেরি করতি অবে।'

'তা আমি জানতাম। কথাটা তখনই বলতিস। অপেক্ষা করতে হলে আর *হঠাৎ* এর মূল্য থাকল কী?'

www.pathagar.com

দুলাল বলল—'স্যার, এইডেই তো অটাৎ এর মজা। আপনি ভাববেন—কহন আসে কহন আসে। এক সুমায়ে মনের আশা ছাইড়ে দেবেন। আর দ্যাখপেন তহনি চা চইলে আইছে।'

'তোকে না আমি কথা কম বলতে বলেছিলাম?'

'জ্বে, স্যার। চিন্তা বেশি করতি কইলেন।'

'তাহলে?'

'সে জন্নিই তো মনের মধ্যি কতা বেশি জমা ওয়ে থাহে। মাথার মদ্যি জ্ঞান থাকলি কতা না কয়ে পারা যায়? স্যার, আপনার বেশি জ্ঞান আছে বইলেই তো বেশি কতা বলতি পারেন। কতা না কতি দিয়েই তো আপনি আমারে জ্ঞানী বানাইছেন। অ্যাহোন মনডা খালি কতা কয়ে ওটে।'

'আয়নার সাথে কথা বলবি।'

'স্যার, এই এট্টা তাজ্জব জিনিস। আপনি উপদেশ দিয়ার পরেত্তে অনেকবার চেষ্টা করিছি, কিন্তু অয় না।'

'হয় না মানে?'

'নিজির দিক তাকালি কি আর কতা কতি ইচ্ছে করে নাকি? খালি নিজিরি দেকতি ইচ্ছে করে। তহন চোখ নিজি নিজিই কতা কয়। জ্ঞান তহন আর কাজে লাগে না।'

'এবার হঠাৎ ক'রে কেটে পড়।'

বুড্ডা দুলালের কথায় হঠাৎ যেন আলো দেখতে পেল। সে জানতে চাইল—'স্যার, আপনার ঘরে কোথায় আয়না আছে একটু বলবেন?'

প্রফেসর তাকে আয়নার ঘরটা দেখিয়ে দিলেন। সে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে। খানিক পরে সে ফিরে এসে বলল—'স্যার, একদম ঠিক কথা। অথচ অন্যান্য সময়ে নফ্‌স খালি কথা বলে। মাঝে মাঝে রেহাই পেলেও অধিকাংশ সময়ে বড় পেরেশানিতে থাকি।'

প্রফেসর বললেন—'আয়না তোমার পেছনেও একটা আছে। ঘুরে বসলেই দেখতে পাবে।'

বুড্ডা ঘুরে দেখল যে তার পেছনেও একটা ছিল, যা তার চোখে পড়েনি। প্রফেসর বললেন—'নফ্‌সের যে প্রশ্ন মন্তব্য ব্যস্ততা কুৎসিত কথাবার্তা—সব চ'লে যেত যদি তুমি পেছনে ফিরতে পারতে। একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখতে পাবে একটা অদ্ভুত রহস্য—গোটা পৃথিবীর মানুষ—সুন্দর হোক আর কুৎসিত হোক, নারী হোক আর পুরুষ হোক—আয়নায় নিজেকে দেখতে খুব পছন্দ করে।

www.pathagar.com

অথচ যেই কেউ আয়নার সামনে দাঁড়ায়, অমনি তার মুখের ভাষা হারিয়ে যায়। সে সারাদিন নিজের দিকে তাকালেও তার তৃপ্তি ওঠে না। সে ভাবে যে সে যাকে দেখছে তার প্রকাশিত সৌন্দর্য নিয়ে সে তৃপ্ত নয়, অথচ তার এও মনে হয় যে পৃথিবীর অন্য সবার চেয়ে সে কোনো একটা দিক থেকে আলাদা, যদিও সে নিজে জানে না তা কী। ফলে তার এই বিশ্বাস, এবং অনুসন্ধিৎসা তাকে নিজের চেহারার মধ্যে অন্য কাউকে আবিষ্কার করার তাগিদ দেয়। পৃথিবীর যে কোনো লোককে সে এক পলকে চিনে ফেলতে পারলেও নিজেকে সে এক পলকে চিনে ফেলতে পারে না, চিনতে চায়ও না। সে ভাবে যে সে নিজেরই ছবির মধ্যে আরেকটু গভীরে কোথাও লুকিয়ে আছে। তাকে দেখতে হলে আরো দু'ঘণ্টা একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু এই দুই ঘণ্টা তথা যে কোনো মাপের সময়ের ধারণাটাও আসে সেই ভেতর থেকে। ফলে সময়টা আর শেষ হতে চায় না। আসলে সে বুঝতে পারে না তার আসল রূপের সাথে তার বাহ্যিক রূপের দূরত্ব অনন্ত সময়; অর্থাৎ অনন্তকাল ধ'রে দেখতে থাকলেও তার সন্ধানের তৃষ্ণা মিটবে না। অথচ সে যদি হঠাৎ ক'রে দেখে ফেলতে পারত ...'

'...আহ! সুন্দর কথাটা বলেছেন, স্যার ... হঠাৎ ক'রে ... আহ! এত অপেক্ষা ... এত কষ্ট ... এত হতাশা ... মনে হয়, সবকিছু যদি হঠাৎ ক'রে ঘটে যেত! ... আহ! শব্দটা ডিকশনারিতে বেশ কয়েকবার থাকার দরকার ছিল।'

'দুলালের চা তাই হঠাৎ ক'রে কপালে জোটে না, আর আমরা যার কথা বলছি তা তো হঠাৎ ক'রে পাওয়া উচিৎ-ই নয়। যা হোক, যদি সে হঠাৎ ক'রে দেখে ফেলতে পারত সে আসলে কে, তাহলে দেখতে পেত যে আর সময় ব'লে কিছু নেই, অপেক্ষা ব'লে কিছু নেই, অতৃপ্তি নেই ব'লে আফসোস নেই ব'লে অতীত ব'লে কিছু নেই, অপেক্ষা নেই ব'লে ভবিষ্যৎ বলেও কিছু নেই ব'লে আছে শুধু চিরবর্তমান। তখন তার উৎসের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে যেত। তার উৎস নিজেই চিরবর্তমান (আল-ওয়াসি'ই এবং আস-সমাদ)। তখন ব্যাপারটা ঘটত দুলালের চায়ের মতো—এসে পড়লে আর দেরি হবে না, তা হঠাৎ ক'রেই ঘটবে। না আসা পর্যন্ত ...'

'জ্বী,স্যার। বলুন ..., প্লিজ ...'

'না আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করছ একটা *হঠাৎ* - এর জন্য।'

'জ্বী, স্যার। ঠিক এই মুহূর্তের জন্য যদি কোনো সত্য কথা থেকে থাকে তাহলে তা হলো আপনি যা বলেছেন তা। কারণ আপনি তাই বলেছেন যা এখন ঘটছে না, অথচ মারাত্মকভাবে এখন তা-ই ঘটার দরকার ছিল।'

'জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে দাও।'

'জ্বী, স্যার। খেয়াল থাকে না। সবকিছু বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।'

www.pathagar.com

এমন সময়ে দুলাল এল।

'যাক, হঠাৎ ক'রেই এলি!'

'জ্বে, স্যার। খালি কাপ-পিরিচ থুয়ে যাচ্ছি। চা এট্টু দেরি অবে।'

প্রফেসর চোখ চেরা ক'রে খালি কাপ-পিরিচের দিকে তাকালেন। বুড্ডা *আহ!* ব'লে একটা বড় নিঃশ্বাস ছেড়ে বুক থেকে একটা সোমত্ত আগ্নেয়গিরি ছেড়ে দিল। তার চোখ থেকে দর-দর ক'রে পড়তে লাগল অশ্রু।

প্রফেসর বললেন—'তুমি তোমার ভেতরের আয়নার দিকে পেছন ফিরে আছ, যে কারণে তুমি দেখতে পাচ্ছ না তুমি কে।'

'ভেতরের আয়না?'

'হ্যাঁ। আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর স্বভাবধর্ম দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ওটাই গোটা মখলুখের আয়না, শুধু তোমার নয়। তার দিকে তুমি চোখ ফেরাচ্ছ না:

> তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখো। তুমি আল্লাহ্র স্বভাবের অনুসরণ করো, যে স্বভাব অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র স্বভাবের কোনো পরিবর্তন নেই। এ-ই সরল ধর্ম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরাঃ রুম, ৩০)

তুমি উল্টো-মুখী হয়ে আছ। একথা কোরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

> আর হয়ত কোনো একটা বিষয় তোমাদের কাছে অপ্রিয় মনে হয়, অথচ আসলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং হয়তো বা কোনো বিষয় তোমাদের কাছে প্রিয় মনে হয়, আসলে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।
> (সূরাঃ বাকারাহ্, ২১৬)

আল্লাহ্র কাছে যা প্রিয় তোমার কাছে তা অপ্রিয় এবং তাঁর কাছে যা অপ্রিয় তোমার কাছে তা প্রিয় মনে হয়। তাঁর পছন্দ থেকে তোমার পছন্দ একশ' আশি ডিগ্রী উল্টোদিকে অবস্থান করছে ব'লেই এরূপ হচ্ছে। ফলে তাঁর দৃষ্টিতে যা মন্দ, তোমার দৃষ্টিতে তা ভালো ব'লে মনে হচ্ছে। আমি তোমার চোখ-দুটো খুলে পেছনে লাগিয়ে দিতে পারতাম!

www.pathagar.com

বলে দিনঃ তোমরা অনুসরণ কর আল্লাহ্‌র এবং রাসূলের। তবে যদি তারা ***মুখ ফিরিয়ে নেয়***, তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ্ কাফেরদের ভালোবাসেন না। (সূরাঃ আল ইমরান, ৩২)

এরপর যারা ***মুখ ফিরিয়ে নেবে*** তারাই হবে নাফরমান।
(সূরাঃ আল ইমরান, ৮২)

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল। আর কেউ ***মুখ ফিরিয়ে নিলে***, আমি তো আপনাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি। (সূরাঃ নিসা, ৮০)

হে আমার কওম! তোমরা প্রবেশ কর পবিত্র ভূমিতে যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং ***পেছনে ফিরে*** যেও না, গেলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (সূরাঃ মায়িদাহ, ২১)

শয়তান তো চায় তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করতে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকেও সে তোমাদের ***বিরত রাখতে*** [উল্টোমুখে ফিরিয়ে রাখতে] চায়। তবে কি তোমরা এখনও নিবৃত্ত হবে না?
(সূরাঃ মায়িদাহ, ৯১)

বরং তাদের সামনে তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে যা তারা ইতিপূর্বে গোপন করত। আর যদি তারা ***প্রত্যাবর্তিত হয়*** [মুখ ফিরায় এবং গতি পাল্টায়] তবুও তারা তাই পুনরায় করবে, যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। আর নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।
(সূরাঃ আন'আম, ২৮)

আর তোমরা তাঁকে বিস্মৃত হয়ে ***পেছনে*** ফেলে রেখেছ! নিশ্চয়ই আমার রব তোমরা যা কর তা পরিবেষ্টন করে আছেন।
(সূরাঃ হুদ, ৯২)

অবশেষে তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তাদেরই মন্দ কাজের শাস্তি এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল। [কারণ তাদের পেছনটা সামনে চ'লে গিয়েছিল] (সূরাঃ নাহল, ৩৪)

আর আমি তো রাসূলগণকে পাঠিয়ে থাকি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; কিন্তু কাফেররা অনর্থক কথা নিয়ে ঝগড়ার সৃষ্টি

www.pathagar.com

করে, যেন এর মাধ্যমে সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে; আর তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যা দিয়ে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে সেগুলোকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে। [তারা ***বিপরীতমুখী*** হয়ে গেছে ব'লে সত্যকে তাদের কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে।] (সূরাঃ কাহ্‌ফ, ৫৬)

আর যে আমার স্মরণ থেকে ***মুখ ফিরিয়ে নেবে***, তার জীবনযাপন হবে সংকুচিত এবং কেয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাব। (সূরাঃ ত্বাহা, ১২৪)

মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় নিকটবর্তী হয়েছে, অথচ তারা অসতর্কতার মধ্যে ***মুখ ফিরিয়ে রয়েছে***। (সূরাঃ আম্বিয়া, ১)

তোমাদেরকে শুনানো হত, কিন্তু তোমরা ***পেছনে ফিরে সরে পড়তে***। (সূরাঃ মু'মিনুন, ৬৬)

আর যে ব্যক্তি তওবা করে এবং ভালো কাজ করে, সে তো বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র ***অভিমুখী হয়***।

(সূরাঃ ফুরকান, ৭১)

যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, আমি তাদের কর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছি, ফলে তারা বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। [তাদের মূলবোধটাও ***বিপরীতমুখী*** হয়ে গেছে, ফলে 'ভালো'র সংজ্ঞাটাই তাদের ধারণায় আলাদা হয়ে গেছে।]

(সূরাঃ নাহল, ৪)

আমি তাকে ও তার কওমকে দেখেছি, তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে সূর্যকে সেজদা করছে এবং ***শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য শোভন করে রেখেছে***, ফলে তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে, তাই তারা সৎপথ পায় না [*উল্টোদিকে* মুখ ফিরিয়ে রাখে]। (সূরাঃ নামল, ২৪)

আপনি তো মৃতকে শুনতে পারেন না এবং বধিরকেও আহবান শুনাতে পারেন না, যখন তারা [*উল্টোদিকে*] ***পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়***। (সূরাঃ নামল, ৮০)

www.pathagar.com

তোমরা আমাকে ডাকছ যেন আমি আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করি এবং এমন বস্তুকে তাঁর শরীক করি, যার পক্ষে আমার কাছে কোনো জ্ঞান নেই। আর আমি তোমাদেরকে ডাকছি প্রবল পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র ***দিকে***। [সুতরাং বুঝতে শেখ এবং ***মুখ ফিরাও***] (সূরাঃ মু'মিন, ৪২)

নিঃসন্দেহে, তোমরা আমাকে ***যার দিকে*** ডাকছ, [তা ***উল্টো*** দিক] দুনিয়া ও আখেরাতের কোথাও সে দাওয়াতের যোগ্য নয়। নিশ্চয়ই আমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছে [বিপরীত দিকে] ***ফিরে যেতে হবে***, সীমালংঘণকারীরা অবশ্যই দোযখবাসী হবে।

(সূরাঃ মু'মিন, ৪৩)

এটি একটি কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী ভাষায় কোরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ***মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে***, অতএব তারা শুনেই না [কারণ কোরআনের আকর্ষণী শক্তি তাদের কাছে বিকর্ষণস্বরূপ হয়]। (সূরাঃ হা-মীম-সিজদাহ, ৪)

অতঃপর তারা তাকে ***পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল*** এবং বলল: সে তো শিক্ষাপ্রাপ্ত পাগল [অর্থাৎ সে *উল্টোটাই* বুঝল]।

(সূরাঃ দুযান, ১৪)

আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে [*উল্টোদিকে*] ***মুখ ফিরিয়ে নেয়***।

(সূরাঃ নাজম, ৩৩)

সে মনে করত যে, তাকে কখনও ***ফিরে যেতে*** হবে না।

(সূরাঃ ইন্‌শিকাক্, ১৪)

বরং যারা কাফের তারা তো লিপ্ত রয়েছে মিথ্যারোপ করায়, আর আল্লাহ্ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন। [অর্থাৎ তুমি যেদিকেই মুখ ফিরাও, তিনি তোমার সামনেই আছেন, শাস্তি বা শাস্তিরূপে।] (সূরাঃ বুরূজ, ২০)

সুতরাং এখন তোমাকে এই আয়াতের দিকে খেয়াল দিতে হবে:

www.pathagar.com

আমরা তো তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং *ফিরে তো তোমারই কাছে যেতে হবে।*

(সূরাঃ মুমতাহীন, ৪)

তুমি যদি নফ্সকে কন্ট্রোল ক'রে এবং পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন ক'রে তোমার সব আশা-আকাঙ্খাকে তীব্র অপেক্ষার আগুনে পুড়িয়ে ছাই ক'রে উল্টো ঘরে ফিরে যেতে, তাহলে সেই আয়নার মধ্যে গোটা সৃষ্টিজগৎকে দেখতে পেতে। তখন থাকত না কোনো সন্দেহ, কোনো খণ্ডত্ব। তখন তোমাকে আর প্রশ্নের ছুরিরা আহত করত না। বরং পুরনো ক্ষতগুলো থেকে সুগন্ধি বের হতো।'

'স্যার, আগামীকাল সকালে আপনার জুতোজোড়া পরিষ্কার ক'রে দেব।'

'আমি তো চাই যে আমার জুতো পরেই তুমি পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াও। অতটা দূরত্ব রাখার দরকার কী?'

'স্যার, আমার মনে হচ্ছে আমি আপনার কাছ থেকে অনেক দূরে ব'সে আছি।'

'তাহলে আরো দূর থেকে ছুটে আসার চেষ্টা কর। হাতের কাছে চলাফেরা করার মধ্যে তেমন গতি সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকে না। দূর থেকে ছুটে এসেই বড় ল্যাফটা দেয়া যায়। সব সময়ে ভাবা উচিৎ যে প্রিয়জন অত্যন্ত দূরে আছেন, ফলে অনেক সাধনা ও শ্রমের বিনিময়ে সেখানে পৌঁছানো দরকার। প্রিয়জনকে কাছে ভাবা মানে তাকে ছোট ক'রে দেখা।'

'স্যার, আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন, ওর পায়াতে ঘুণ পোকা নেই।'

'আমি যে বইগুলো পড়ি তা পোকায় কাটলেও আমার কোনো ক্ষতি নেই।'

'স্যার, আপনি চিন্তা না ক'রেই সত্য কথা বলতে পারেন। হঠাৎ ঘুম থেকে আপনাকে জাগিয়ে তুললেও দেখা যাবে যে আপনি গোপন ভঙ্গিতে মিথ্যে বলছেন না।'

'আকস্মিকভাবে আত্মসমর্পণ কর। যে কথার পেছনে পরিকল্পনার দরকার হয় তা সত্য কথা নয়। সত্য কথার জন্য কোনো ফর্মুলা লাগে না, তা নিজেই ফর্মুলা। তা শ্রোতার কানকে শীতল ক'রে দেয়।'

'স্যার, আপনি যদি আমার কানে গরম শীশা ঢেলে দিতেন। মাঝে-মধ্যে ভারি ভারি শব্দগুলোকেও মনে হয় বেলুনের মতো হালকা।'

www.pathagar.com

তোমার কানকে ঢাকা ভার্সিটির ল্যাবরেটরিতে বিক্রি ক'রে দাও। ওর অপারেশন দরকার। আল্লাহ্ ব্যাধিগ্রস্ত চোখ ও কানের ব্যাপারে কোরআনে অনেক তথ্য দিয়েছেন:

> তারা কি দেশভ্রমণ করেনি, যাতে তারা তাদের হৃদয় দিয়ে বুঝতে বা চোখ দিয়ে দেখতে পারে? চোখ তো অন্ধ নয়, বরং বুকের মাঝের হৃদয়ই অন্ধ। (সূরাঃ হজ, ৪৬)

> আমি যদি আজমি (অ-আরবি) ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করতাম ওরা অবশ্যই বলত, 'এর আয়াতগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হলো না কেন? কী আশ্চর্য, ভাষা আজমি আর রসুল আরবীয়! বলো, 'বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তারা কানে শুনতে পায় না আর (চোখে) অন্ধ। তাদেরকে যেন বহুদূর হতে ডাকা হচ্ছে।
> (সূরাঃ হা-মিম-সিজদা, ৪৪)

দুলাল এসে কাপ-পিরিচ ফেরত নিয়ে গেল।

'কি রে দুলাল, আর কবে?'

'স্যার, আজকে অবেনানে। কেটলিটা ফুটো হয়ে গেছে।'

প্রফেসর চুপ হয়ে গেলেন। বুড্ডা বড় একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল।

খানিক পরে প্রফেসর তার দিকে তাকিয়ে পড়লেন। তাঁর মুখখানা থমথমে। তবুও যেন তার মধ্য দিয়ে একটা ধারালো অর্থময়তা ঝকঝক ক'রে উঠল। বুড্ডা কষ্টে নিঃশ্বাস টেনে নিচ্ছে দেখে তিনি বললেন—'জোরে নিঃশ্বাস ছাড়।'

বুড্ডা জোরে নিঃশ্বাস ছাড়তে গিয়ে বুকের জমিন কাঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

প্রফেসর বললেন—'আসল আলোচনায় এখন প্রবেশ করা যাবে না। আগে কেটলির সমাধান করতে হবে। চল আমার সাথে। ও বাসা থেকে খাওয়া সেরে এখানে ঘুমাতে আসবে।'

www.pathagar.com

চার. ছায়ার অন্ধকার

প্রফেসর কলিং বেল চাপলেন।

ভেতর থেকে—'কে?'

'দরজা খোলো, মা।'

'সাথে কেউ আছে, আব্বু?'

'ছোট একটা বাচ্চা।'

'ছেলে বাচ্চা নাকি মেয়ে বাচ্চা?'

'প্রথমত বাচ্চা, দ্বিতীয়ত ছেলে।'

দরজা খুলে গেল। বুড্ডার চোখ-মুখ-চিন্তা-হতাশা-অপেক্ষা-কামনা-তৃষ্ণা ভরাট ক'রে দিয়ে এক ঝলক হলদে আলোর সুঘ্রাণময় ঝড় এসে তাকে চমকে দিয়ে তার পুরা বুকটা লন্ডভন্ড ক'রে দিল। সে সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে ফেলল। সে মনে মনে প্রার্থনা করল—'আল্লাহ্, তুমি কি আমাকে এজন্য ঢাকায় পাঠিয়েছ? এত সুন্দর আমি জীবনেও দেখিনি। আর যেন না দেখি। সুন্দর হওয়ারও একটা সীমা আছে। হে আল্লাহ্! কে মারাত্মক সুন্দর হওয়ার মতো জঘণ্য অন্যায় ক'রে ফেলল তার বিচার যেন আমি না করতে যাই।' তার হৃৎকম্প বেড়ে গিয়েছিল। সে ড্রয়িং রুমে সোফায় বসতে বসতে ভাবল—'বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো ফকির আমি। বছরে একটা নারীমূর্তিও চোখে বাধে না। এই তো ভালো ছিলাম। কেন যে ভাগ্য আজ এখানে টেনে আনল। সে তার মনের পট থেকে ছায়ার মুখচ্ছবিটাকে কোনোভাবেই মুছতে পারছিল না। তাই সে ভাবল—'ভুলতে যখন পারছি না, তখন আল্লাহ্র হক আদায় করি'—এই ভেবে সে মনে মনে ব'লে উঠল, 'সুবহানাল্লাহ।' অমনি তার সারা দেহমনে একটা তৃষ্ণার জোঁয়ার বয়ে গেল। সে মনে মনে ফরিয়াদ করল—আল্লাহ্! তৃপ্তি স্বীকার করলাম, আর অমনি তুমি তৃষ্ণা বাড়িয়ে দিলে? সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ভেতর থেকে লুকানো কোনো এক মন ব'লে উঠল—তুমি প্রশংসা করেছ এক রূপসী মেয়ের। তার স্রষ্টার নয়। —সাথে সাথে সে তওবা পড়তে লাগল।

এতক্ষণে ঘরের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে—'আব্বু, তুমি আরেকটা কাজের লোক জুটিয়েছ? কয়টা লোক লাগে তোমার? আর কাজের লোক রাখলেই

www.pathagar.com

প্রথমদিন তাকে ডায়নিং-এ খাওয়াতে হবে—এই অভ্যাসটাও ছাড়তে পারলে না। যাকে তাকে হুট ক'রে বাসায় টেনে আনার স্বভাব তোমার আর গেল না।'

'আহা, মা। আস্তে বল। আগে শোন ...'

'এতে আবার আস্তে বলার কী হলো? ও ভালো কথা, আব্বু, তোমার ঐ ছেলেটাকে একটু দোকানে পাঠাও তো। একটা ম্যাচবক্স আনার দরকার।'

'আহ - মা ছায়া, তুমি আমার কথা শোনো। দোকানে যাওয়ার অন্য লোক আছে তো ...'

'অত আহলাদ ভালো না। আচ্ছা আমিই যাচ্ছি...'

বুড্ডা বাবা-বেটির ঝগড়ার সবটুকু শুনতে পেল। সে তার ব্যাপারে ছায়ার ধারণার কথা জানতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। মনে মনে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিল: 'আল্লাহ্, তুমি আসলেই অসীম প্রজ্ঞাবান। তুমি সেকেন্ডের মধ্যে পরিস্থিতিটাকে এমনভাবে বদলে দিলে যে আমার মনের মধ্যে ছায়ার রূপের যে ছায়াটা পড়েছিল এখন তার স্মৃতিটুকুও নেই। প্রভু গো, সমস্ত পরিস্থিতি আসলে তোমারই নিয়ন্ত্রণে। তুমি সদাজাগ্রত। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মানুষের মন পুরোপুরি তোমার হাতের মুঠোয়।'

এমন সময়ে ছায়া ড্রইং রুমে এসে ঢুকল। বুড্ডা জানে তাকে দোকান থেকে ম্যাচবক্স আনতে হবে। সে চোখ নিচু ক'রে রইল। 'এই, তুমি একটু পাশের দোকান থেকে এক ডজন ম্যাচবক্স নিয়ে এস তো।'

বুড্ডা মাথা নিচু ক'রে টাকাটা নিল। সে দরজা থেকে বের হয়ে সিঁড়ি পার হতে হতে শুনতে পেল—'টাকাটা গুনে আনবে কিন্তু।' বুড্ডা ভাবল—ভালোই হলো, টাকা গুণে নেয়া অভ্যেস আমার নেই। সুতরাং না বললে মনে থাকত না।

বুড্ডা ঘর থেকে বের হয়ে গেলে প্রফেসর মেয়েকে বুঝাতে চাইলেন যে সে আসলে তাঁর কাজের লোক নয়, ছাত্র, কিন্তু তিনি তাঁর কথা বলার মধ্যে বাধা পেলেন ব'লে কথাটা বলতে পারলেন না। তাছাড়া এখন কথাটা বললে মেয়েটা লজ্জা পাবে ভেবে তিনি চুপ ক'রে রইলেন। অবশ্য ছায়া তাকে শুনিয়ে দিল—'আব্বু, তোমার আড্ডালিটা গরিব হলে কি হবে, গায়ে সুগন্ধি মাখে ব'লে মনে হলো, ঘরটা ঘ্রাণ ঘ্রাণ হয়ে গেছে।'

প্রফেসর মেয়ের দিকে তাকিয়ে পড়লেন।

কিন্তু ছায়া তাঁর দিকে না তাকিয়েই তার মতো কথা ব'লে চলল। 'ওর নামটা ... আচ্ছা থাক, ওর কাছ থেকেই জেনে নেব।'

বুড্ডা ফিরে এল। ছায়া দরজা খুলল। বুড্ডা তার দিকে তাকাল না। সে ঘরে ঢুকে টী টেবিলের ওপর ম্যাচবক্স এবং টাকাগুলো রেখে মাথা নিচু ক'রে ব'সে রইল। ছায়া টাকাটা নিয়ে দু'বার গুণে দেখল। তারপর প্যাকেট থেকে ম্যাচবক্সগুলো বের ক'রে একে একে সবগুলো পরখ ক'রে দেখল। 'নকল ম্যাচ

www.pathagar.com

আননি তো আবার?' বুড্ডা কথা বলল না, মুখ তুলে তাকালও না। 'এই নাও, দু'টাকা রেখে দাও। পান খেও।' সে দু'টাকার একটা নোট টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল। বুড্ডা তার আচরণে অত্যন্ত খুশি হলো। এত খুশি যে সে এখন পুরোপুরি হালকা, ঝরঝরে বোধ করছে। কিন্তু সে টাকাটার ব্যাপারে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। যদি সে তা নেয়, তাহলে মেয়ের পাগলামিপূর্ণ আচরণের কারণে স্যার লজ্জা পেতে পারেন, আবার যদি সে তা না নেয়, তাহলে তা তার তরফ থেকে মেয়েটার প্রতি বেয়াদবিও হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া টাকাটা না নিলে তার নিজেরই ক্ষতি—তাতে তার প্রতি তার একটা আকর্ষণ রয়েও যেতে পারে। বরং তার কাছে কাজের লোক হিসেবে গণ্য হয়ে থাকাই ভালো হবে। সে টাকাটা পকেটে পুরল। প্রফেসর ওঘর থেকে এই দৃশ্য দেখে মুখটাকে চিন্তিত ক'রে রাখলেন।

খাবার টেবিলে বুড্ডার ডাক পড়ল। প্রফেসর নিজে ভাত উঠিয়ে নিলেন। কিন্তু বুড্ডার থালায় আগে থেকেই ভাত দেয়া আছে। এক গাদা ভাত। সে অত ভাত খায় না। তাই সে প্লেটে হাত লাগানোর আগেই বলল—'স্যার, ভাত অর্ধেক কমাতে হবে। এত খাই না।'

অমনি পাশের ঘর থেকে মেয়েটা ব'লে উঠল—'মা, যাক তোমার ভাতে কম পড়ল না।'

প্রফেসর মুখটা নিচু ক'রে রইলেন। বুড্ডা তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে হাসিমুখে খেতে বসল। অবশ্য সে এমন একটা চেয়ার বেছে নিল যেখান থেকে তাকে অন্য ঘরের কেউ দেখতে পাবে না—অন্তত মুখটা দেখতে পাবে না।

ছায়া বাবাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—'আচ্ছা আব্বু, তোমার ঐ ছেলেটার নাম যেন কী?'

বুড্ডা প্রফেসরের দিকে তাকাল—উত্তরটা তিনি দিচ্ছেন নাকি তাকে দিতে হবে তা আঁচ করার জন্য। প্রফেসর গালে-ভাত অবস্থায় জবাব দিলেন—'বুড্ডা।'

ওঘরে হঠাৎ নীরবতা এবং কয়েক সেকেন্ড পর খিলখিল হাসি—'ও মা! ভারি আহ্লাদি নাম তো! মনে হয় মায়ের আহ্লাদি ছেলে। তো, আব্বু, তুমি ওকে অতটা আহ্লাদ দিয়ে রাখতে পারবে তো?'

বুড্ডা মুচকি হাসল।

প্রফেসর বললেন—'নামটা কি তোমার পছন্দ হয়নি, মা?'

'এ নাম কোনো বইতেও নেই। আমার মতে আমরা ঘরোয়াভাবে একটা নতুন নাম দিতে পারি, কী বল, বাবা?'

'এ ব্যাপারে তোমার সাথে পরে আলোচনা করব, মা।'

www.pathagar.com

পাঁচ. একত্বের খেসারত

পরদিন প্রফেসর সন্দেহবিদ সকালেই চ'লে এলেন বুড্ডার কাছে। তিনি বুড্ডার জন্য নাস্তা বয়ে নিয়ে গেছেন। বুড্ডা গুরুকে কষ্ট দিতে হলো ব'লে লজ্জিত হলো। এটা বুঝতে পেরে গুরু সন্দেহবিদ বললেন—'অসুবিধা নেই। লজ্জার সাথেই খাও।'

প্রফেসর ভার্সিটিতে চ'লে গেলেন। বুড্ডা তাঁর লাইব্রেরিতে বই ঘাটাঘাটি করার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলো। সে বহুকাল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর লেটেস্ট কোনো বই পড়েনি। মানব জাতিটা কেমনভাবে দ্রুত দৌড়াচ্ছে তা অত্যন্ত ছোট্ট একটা কাগজে লিখে বা এঁকে দেখার শখ তার অনেক দিনের। সে গুরুর জার্নালের সংগ্রহ দেখে খুব খুশি হলো। ছাত্রজীবন বড় বড় বই পড়ার জীবন। তা বড় বিরক্তিকর। কিন্তু প্রফেসরদের মর্যাদা এখানেই যে তারা অধিকাংশ সময়ে অত্যন্ত ছোট বই-পুস্তক প'ড়ে থাকেন। তারা এক পৃষ্ঠা প'ড়ে পাঠ্য বইয়ের হাজার পৃষ্ঠার নির্যাস লাভ করেন। সে ফিলোসফি, হিসট্রি, সাইকোলজি এবং সোশোলজির জার্নালগুলো ওল্টাতে লাগল। ভাগ্যিস সে তত্ত্বীয় জ্ঞানে এবং মেথোডোলজিতে বেশ পাকাপোক্ত জ্ঞান এর আগেই পেয়েছে। নইলে রির্সাস পেপার পড়ার সৌভাগ্যটুকু সে ভোগ করতে পারত না। একটি জার্নালের একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র আর্টিকেলের abstract-এ চোখ বুলিয়ে সে অবাক হলো—এত অল্প কথা লেখার জন্য মানুষকে এত বেশি জ্ঞান অর্জন করতে হয় কেন? সিদ্ধান্ত যত ছোট এবং সংক্ষিপ্ত হয়, তার পেছনের আলোচনা এবং বিশ্লেষণও হয় তত বিশাল এবং দীর্ঘ। যত অল্প কথায় কোনো বিষয়ের জবাব আশা করা হয়, সেই বিষয়ের ওপর তত বেশি বেশি প্রশ্ন আরোপ করা লাগে। শুধু তাই নয়, মূল আবিষ্কারটি যত ছোট হয়, তত ভালো, নইলে তা জীবনের কাজে খাটানো যায় না। বেশি ঘোরাঘুরি করতে হয় পথ খোঁজার সময়ে, তা খুঁজে পেলে আর ঘোরাঘুরিরই প্রয়োজন হয় না, তখন সোজা হেঁটে চ'লে যাওয়া যায়। আর সোজা হেঁটে চ'লে যাওয়ার সময়ে গল্প উপন্যাস লেখার কোনো প্রয়োজন নেই, দুয়েকটা গান গাইলেই চলে। আশেপাশে কেউ না থাকলে একটা শিশ বাজানোও যেতে পারে। সমস্যা হলো আশেপাশে লোক থাকা—তখন কথা একটু বেশি বলা লাগে,

www.pathagar.com

অযথা গালগল্প করা লাগে। কিন্তু ***সঠিক পথে চলতে চলতে যখন কেউ একা হয়ে যায়, তখন যত মজা তার।***

কত ভালো হতো যদি মানুষ অত্যন্ত কম কথায় নিজের উদ্দেশ্যটাকে এবং আত্মপরিচয়কে তুলে ধরতে পারত। কিন্তু তাতেও যে সমস্যা নেই তা নয়। কারণ যারা তা পেয়েছেন—এমনকি যারা কোনো ভাষার সাহায্য ছাড়াই কথা বলতে শিখেছেন—তারা চিন্তায় সংক্ষিপ্ত এবং বোধে বিশাল হতে পারলেও তাদের দ্বারা অন্যের কোনো লাভ হচ্ছে না। কারণ কেউ সোজা পথটাকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না, সবাই পথ পাওয়ার আগে একটু বেশি পরিমাণে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হতে চায়।

সে ভাবল, যাকিছু সংক্ষেপে বোঝা যায়, তা যদি সংক্ষেপে বোঝানোও যেত তাহলে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা মানবজাতির লাভ হতো। সারাজীবন কাঠ-খড় পুড়িয়ে যারা সংক্ষেপে বোঝার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাদের কাছ থেকে অন্যেরা যদি তা সংক্ষেপে বুঝতে পারত, তাহলে কতই না ভালো হতো—একই জ্ঞান পাবার জন্য প্রত্যেককে বারবার একই ভুল করা লাগত না।

কিন্তু মানুষ যে তার অজ্ঞতার জন্য জ্ঞানী হতে পারছে না তা নয়, অজ্ঞতাই জ্ঞানের পথকে সুগম করে, যদি অজ্ঞ ব্যক্তি স্বীকার করে যে সে অজ্ঞ। অজ্ঞতার সচেতনতা এবং স্বীকৃতিই প্রথম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান যা অন্যান্য জ্ঞান অর্জনের পরেও তার শ্রেষ্ঠত্ব হারায় না। কিন্তু মানুষ দ্রুত এগোতে পারছে না তার অহংকারের কারণে। অহংকারের ওজন গোটা মহাবিশ্বের ওজনের মতো। অথচ মানুষ তা বহন ক'রে নিজের ঘাড়-কোমর ভাঙে এবং দোষটা দেয় নকল ওষুধের। নকল ওষুধের কোনো দোষই নেই। সৎ মানুষকে ধ'রেই নিতে হবে যে নকল ওষুধ ব'লে মহাবিশ্বে কিছু নেই—দোষ দেয়া তো পরের কথা! যা নকল তা তো গ্রহণযোগ্যই নয়; সুতরাং সে দোষের ভয় পায় না—দোষ দিলে যদি তার মান যাবার ভয় থাকত, তাহলে বরং তাকে দোষ দেয়া যেত বা তাতে লাভ হতো। মানবজাতির মধ্যে যা থাকারই কথা ছিল না, তা নিয়ে আলোচনা না করাই বরং ভালো। আসলকে নিয়ে প'ড়ে থাকলে 'নকল' শব্দটারই সৃষ্টি হতো না। নামাজ ও ধ্যানে কী হয়? নকল তাড়াতে তাড়াতেই আসল হারিয়ে যায়। আসলে নকলকে তাড়ানোরই তো কোনো দরকার ছিল না। যা নেই তাকে তাড়াতে গিয়েই তো আমরা প্রথমে কল্পনায় তাকে সৃষ্টি করি। আর যে কল্পনা দিয়ে আমি কিছু সৃষ্টি করি, সেই কল্পনা দিয়ে তা আবার তাড়াব কি ভাবে? সে ভাবল—**মানবজাতির সমস্যাগুলো সব কাল্পনিক। এত দুঃখ, যন্ত্রণা, হতাশা, বিয়োগ সবই কাল্পনিক। মানুষ তার কল্পনাকে এত বেশি মূল্য দিয়ে ফেলেছে যে তা এখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এ থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় হলো কথা কম বলা এবং আদৌ**

www.pathagar.com

চিন্তা না করা। পৃথিবীর কেউ কখনও বলেনি যে ভালোবাসতে গেলে চিন্তা করার প্রয়োজন হয়। সে ভাবল—পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম না হলেও সংক্ষিপ্ততম শব্দ হলো 'এক'। আল্লাহ এক, ইমান এক। ইমান মানেই তো এক-কে একবার মাত্র চিরতরে অন্তরে স্থান দেয়া। মাত্র একবারের সিদ্ধান্তে একটা মাত্র পথকে অনন্ত কালের জন্য গ্রহণ করা। অথচ সেই একবারের সিদ্ধান্ত নিচ্ছি লক্ষ লক্ষ বার, তবুও তা অন্তরে স্থির হচ্ছে না। 'এক' কোনো সংখ্যা নয়। এক মানে কোনোরূপ হিসাব চিন্তাকল্পনার আগেই মনে যা উদিত হয়। কারণ, পৃথিবীর কখনও কেউ কোথাও বলেনি যে এক-কে গোনা লাগে। গোনা শুরু হয় তো 'দুই' থেকে। কারণ তখন গণনার জন্য কোনো অবলম্বন লাগে—আঙুল, তসবি, না হয় অ্যাবাকাস, কিংবা ক্যালকুলেটর। কিন্তু 'দুই' এর আগে যা, তাকে না দরকার হয় মুখস্থ রাখার না দরকার হয় চিহ্নিত ক'রে রাখার। অথচ তার পরেও নিয়তের মধ্যে এক স্থির হয় না কেন? কেন এককে গ্রহণ করা লাগছে একাধিকবার?

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে তার মনে হচ্ছিল যে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কথাগুলি ভাবছে। সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানটি পেয়েছে, যদিও সে তা জেনেছে কেবল মস্তিষ্ক দিয়ে, সে তা তার হৃদয়ে স্থান দেয়ার যোগ্যতা এখনও অর্জন করেনি। এমন সময়ে গুরু এলেন— 'হেঃ হেঃ এক চিন্তা কতবার করা লাগে?'

'স্যার, আপনি একাই এসেছেন ?'

'হ্যাঁ। বহুদিন থেকে আমি এখানে একাই আসছি। তুমিও তো এখানে একাই আছ।'

'জ্বী। সবাই এক মনে এক-এক কাজ ক'রে যাচ্ছি। আর এ কারণে গাদা গাদা এক সৃষ্টি হচ্ছে। সঠিক ঐক্য টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।'

'আসল রোগটাই তো ধ'রে ফেলেছ। তাহলে কি আমরা অধিকাংশ লোকে শেরেকি করছি না ?'

'কিন্তু কেন হচ্ছে এই সমস্যা?'

'সমস্যার উৎস মাত্র একটাই।'

'এক কথায় বলবেন ব'লে মনে হচ্ছে।'

'এক।'

'বোঝার আগে যতটুকু বোঝা যায় ততটুকু বুঝেছি।'

'যত সমস্যা এক আল্লাহ্‌তে।'

'মনে হচ্ছে আপনার কথাটা সত্য, যদিও মিথ্যে প্রমাণ করতে পারলে ভালো হতো।'

www.pathagar.com

'গাদা গাদা আল্লাহ্ হলে কোনো সমস্যা হতো না। তখন সমস্যা যা হতো তা সবাই হাসিমুখে মেনে নিত। তখন সবাই ভুল ক'রে দোষারোপ করত নিজেকে—বাইরের কোনো 'এক আল্লাহ'কে চিহ্নিত ক'রে তাঁকে দোষারোপ করত না। তা যদি করত, তাহলে এক আল্লাহ্ বলতেন—আমাকে যখন ভালোই লাগছে না, তখন অন্য কোনো আল্লাহ্র কাছে যাও। আছে তো গাদা গাদা। তুমিও বেছে নেয়ার জন্য স্বাধীন। তাহলে আর আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন ?'

'চমৎকার বলেছেন তো, স্যার। জীবনে এই বিষয়টাকে এর আগে এভাবে ভাবিনি।'

'আমি চমৎকার না বলার লোক নই। আল্লাহ এক ব'লে মানুষ নিজে ভুল ক'রেও দোষ চাপায় তাঁর ঘাড়ে। দোষ চাপানোর সময়ে মানুষ এক আল্লাহকেই খোঁজে। অথচ উপাসনা করার সময়ে সে খোঁজে বহুকে। সে তার প্রত্যেকটা আশা-আকাঙ্খাকে এক-এক নিয়তে উপসানা করে:

> তুমি কি দেখ না তাকে যে তার নিজের কামনা-বাসনার উপাসনা করে? তুমি কি তার জন্য ওকালতি করবে? তুমি কি মনে কর ওদের বেশির ভাগ শোনে বা বোঝে? ওরা তো পশুর মতো, বরং তাদের চেয়েও পথভ্রষ্ট। (সূরাঃ ফুরকান, ৪৩-৪৪)

সে তার মনে যখন যা উদিত হয়, তখন তাই করে। একবার ভেবেও দেখে না তার কাজ সার্বিক ঐক্যের অনুগামী হচ্ছে কি না।'

'কিন্তু এক আল্লাহ ছাড়া একাধিক আল্লাহ থাকা কি আদৌ সম্ভব?'

'আমরা তো অসম্ভবকেই বেশি পছন্দ করে থাকি, তাই না ?'

'এক কেন বহু সৃষ্টি করলেন?'

'অন্তর্নিহিত এককে আবিষ্কার করার সুবিধা ক'রে দেয়ার জন্য। তাছাড়া স্রষ্টা মানেই এক, সৃষ্টি মানেই বহু। তুমি যে স্রষ্টাতেই বিশ্বাস কর না কেন, তাঁকে এক-ই হতে হবে।'

'তা জেনেও আমরা কেন সমস্যা পাকাচ্ছি?'

'জানার পরেই তো সমস্যাটাকে ভালোভাবে পাকানো যায়। আল্লাহ বলেছেন যে যারা সমস্যা পাকায় তারা সমস্যার কারণটা সচেতনভাবে জানে: তিনি বলেছেন যে যারা সত্যকে অস্বীকার করে তারা জেনেশুনেই তা করে। মোনাফেক কখনও অজ্ঞ হয় না, বরং সে চালাকই হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ এক ব'লেই যত সমস্যা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন—আমি এক। আমরা প্রত্যেকে বলি—আমি এক। আমরা যে 'আমি' উচ্চারণ করি তা দিয়ে দেহকেই নির্দেশ করি। দেহ মানেই মূর্তি। আল্লাহ বলেছেন :

> যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের উপমা মাকড়সা। সে নিজের জন্য বাসা তৈরি করে, অথচ ঘরের মধ্যে মাকড়সার বাসাই দুর্বলতম, অবশ্য যদি ওরা তা জানত। ওরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যে-কাউকেই ডাকুক, আল্লাহ্ তা জানেন, আর তিনি শক্তিমান, তত্ত্বজ্ঞানী। মানুষের জন্য আমি এসব দৃষ্টান্ত দিই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এ বুঝতে পারে।
>
> (সূরাঃ আনকাবুত, ৪১-৪৩)

তোমার দেহটাকে তুমি বসতবাড়ি মনে কর? এটা তো মাকড়সার ঘরমাত্র। তোমার আশা-আকাঙ্খাগুলো তো এক-এক সময়ে এক-এক অঙ্গে গিয়ে অবস্থান করে। আহ! ইব্রাহিম (আঃ) কেন মূর্তি ভেঙেছিলেন? এজন্য যে আমরা যেন 'আমি' শব্দটা দ্বারা এই দেহমূর্তিকে চিহ্নিত না করি। **আমিত্ব মানে সমগ্রতা। কিন্তু আমরা ভাবি যে এই দেহটাই আমাদের জন্য সমগ্র। এভাবে সামগ্রিক 'আমি'র দিকে খেয়াল ক'রে আমরা প্রতি দিন প্রায় সাড়ে ছয়শ কোটি *আমি* উচ্চারণ করছি। প্রত্যেক আমি'র রেফারেন্স তার নিকটস্থ দেহের দিকে। এভাবে আমরা সবাই একত্ব ঘোষণা করছি এবং একে-একে লাগছে ধাক্কা। আসলে এক ধাক্কাই লাগছে বারবার।**

তুমি মুক্তি চাও? মুক্তি রয়েছে এক-এ। তুমি যে 'আমি' উচ্চারণ করছ, তা দেহ থেকে আসছে না। গভীর ঘুমে তো তুমি 'আমি' উচ্চারণ কর না। কারণ তখন তুমি দেহ-সচেতন নও। তোমার দেহের এক বিন্দু রক্তও এখন যা আছে কিছুকাল আগে তা ছিল না। পাল্টে গেছে। তোমার ছোটবেলার দেহটা এখন আর নেই। অথচ সেই তুমি এখনও 'আমি' বলছ। এখন যদি তোমার দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাল্টে ফেলা হয়, তবুও তুমি তুমি থাকবে। তাহলে কে তুমি? তুমি হলে 'আমি'। দেহটা তুমি নও। 'আমি' টাকে দেহের রেফারেন্স থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারা মানেই মুক্তি। তা নিয়ে বড় বড় তত্ত্বালোচনা আর গল্প-উপন্যাস পড়লে মুক্তি মিলবে না। তোমাকে বাস্তবে তা করতে হবে। তখন আর কোথাও দুই থাকবে না—অন্তত তোমার জন্য দুই ব'লে কিছু থাকবে না। কারণ আমরা যে 'আমি' উচ্চারণ করি তার সুতোয় গোটা সৃষ্ট-অসৃষ্ট জগৎই গাঁথা আছে। ফলে মুক্তি চাওয়াও এক ধরনের আত্মবিরোধ। তুমি তোমাকেই চাও? তা কিভাবে সম্ভব? আবার মুক্তি না চাওয়াও একটা আত্মবিরোধ। তুমি তোমাকে গ্রহণ করছ না—তা কিভাবে সম্ভব ?

www.pathagar.com

মনে রাখবে—আল্লাহ হলেন রহস্য—চিররহস্য। তিনি যখন নিজের প্রতি প্রকাশিত ইঙ্গিত বা রেফারেন্স সৃষ্টি করেন, তখন উচ্চারিত হয় 'আমি'। অর্থাৎ 'আমি' মানে কখনও আল্লাহ নয়। ইদানিং ভ্রান্ত মারেফত নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করছে—নিজেরা সরাসরি অনুশীলন না ক'রে কেবল বই পড়ছে ও লিখছে—তারা একথা প্রচার করছে যে 'আমিই আল্লাহ'। আদৌ তা নয়। 'আমি' হলো প্রকাশ। প্রকাশিত বাস্তবতার ওপারেও আছে বাস্তবতা। এই দুয়ে মিলে অস্তিত্ব (Existence)। একে ধারণ ক'রে আছে যা তার নাম অনস্তিত্ব (Non-Existence)। 'আল্লাহ' শব্দটা এই অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সবকিছুকে ধারণ ক'রে আছে। 'আমি'-র রেফারেন্স এই সবকিছুর প্রতি, কিন্তু 'আমি'-তা ধারণ করে না—অন্তত 'আমি' শব্দটা তা ধারণ করে না। 'আমি'-র সচেতনতা বিলুপ্ত হলে সত্য বা বাস্তবতা নিজেই নিজের প্রতি আলো ফেলে। এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। বললেও তাতে কোনো লাভ নেই। **'আল্লাহ' হলেন পরম বাস্তবতা। 'আমি' হলো বাস্তবতার যে-কোনো ডাইমেনশন থেকে তার ঐক্যের প্রতি রেফারেন্স।** সুতরাং 'আমি আল্লাহ' বলা একটা বিভ্রান্তিকর উক্তি। এজন্য তা বিভ্রান্তিকর যে, এরূপ কথা উচ্চারণের অর্থই হলো এই যে, আমি এক স্থান থেকে 'আমি' উচ্চারণ ক'রে অন্য কোনো কিছুকে তার সাথে সম্পৃক্ত করছি। এই বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য মুখে কিছু উচ্চারণ না করাই ভালো। মনছুর হাল্লাজ (রহঃ) মিথ্যা বলেননি, কারণ তারঁ মুখ দিয়ে কথাটা তিনি বলেননি, কিন্তু কথাটা হয়ে গেছে বিভ্রান্তিকর, কারণ 'এক' এর স্থান শব্দ ও ভাষারও অতীতে। **'এক' উচ্চারণের আগেই এক। সত্য রয়েছে এমন স্তরে যেখানে ভাষা পৌছায় না, বরং সেখান থেকেই ভাষার সৃষ্টি হয়। এ কারণে ঐক্যকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঐক্যই একমাত্র সত্য। আল্লাহ্ যদি দৃশ্য-অদৃশ্য জগতের কেন্দ্র হন, তাহলে 'আমি' হলো সেই কেন্দ্রের ঠিক বিপরীতমুখী বা বহির্মুখী একটা রেফারেন্স। ফলে এই আমিকে তাঁর দিকে উল্টিয়ে ঘুরিয়ে দিলে অর্থাৎ দেহকেন্দ্রিক বা অনুভূত 'আমি'-র বিরোধিতায় সফল হলে বা তাকে ভুলে গেলে সরাসরি কেন্দ্র প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ আমিত্বের বিলুপ্তির প্রান্তে তার নাম 'তিনিত্ব'। আল্লাহ্র এক নাম 'হু' বা 'তিনি'। অর্থাৎ যতক্ষণ তুমি 'আমি'কে উচ্চারণ' করছ ততক্ষণ তিনি তিনিত্বের স্তরেই থাকছেন। ফলে উচ্চারণ কখনও তাঁকে পায় না। এবং তাঁকে যখন কেউ পায় তখন তার উচ্চারণ বন্ধ হয়ে যায়।**

রসূল (সঃ) বলেছিলেন—যে নিজেকে চিনেছে, সে আল্লাহ্কে চিনেছে। সুতরাং আমি বলি কি, আল্লাহ্কে নিয়ে চিন্তা করা বাদ দিয়ে আগে নিজেকে নিয়ে চিন্তা কর। আগে জান তুমি কে। তাহলে তিনি কে তাও জানতে পারবে। সুতরাং আমার কথা মতো কাজ কর। দেহ-তোমার বা অন্যের যারই হোক, বস্তুগত এসব নিয়ে ভাবা কোনো আধ্যাত্মিকতা নয়। জেনে রাখ যে সুখ, দুঃখ, কর্মফল, রোগ-ব্যাধি, পরিস্থিতি সবই তুমি। দেহ এবং বস্তু বাদে যত পরিস্থিতি বা অবস্থা রয়েছে,

www.pathagar.com

সবই তুমি। এই রহস্য জানা হয়ে গেলে কেবল তখনই জানতে পারবে বস্তু ও দেহের মালিককে। তার আগ পর্যন্ত কখনও ভাববে না যে তুমি মানে দেহ। তাই যদি হতো, তাহলে তো অন্য যেকোনো দেহও তুমি। তাহলে আমি কেন আমাকে ভোগ করব না? এভাবে তুমি নিজের দেহ থেকে শুরু ক'রে পরের স্ত্রীর দেহও ভোগ করার কুৎসিত বাসনা মনে প্রশ্রয় দিতে। একদল বিভ্রান্ত মারেফতী তাই করে। দেহ-সচেতনতা বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি জানতেই পার না তুমি কে।'

'মাথায় ঝিম ধরছে।'

'তোমার ঘিলুর মধ্যে চিন্তাগুলোকে আরেকটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া দরকার। মুক্তি কামনা করতে হবে এত প্রবল আগ্রহে যেমন স্বপ্নের মধ্যে কেউ তোমাকে গলা টিপে ধরলে তুমি প্রাণপণে জেগে উঠতে চাও। আকাঙ্খা যখন এমন তীব্র পর্যায়ে চ'লে যায় তখন চিন্তাগুলোকে শেষবারের মতো এলিয়ে দেয়ার দরকার হয়। অবস্থা যখন পাগলামিকেও হার মানায় তখন একটানে চিন্তাগুলোকে একত্র ক'রে দিলেই আসল কাজটা ঘটে যায়। তোমার চিন্তাগুলো রয়েছে বিশৃঙ্খল অবস্থায়। তাদেরকে একত্র করতে গেলে তাদের মধ্যে নতুন ক'রে ওলট-পালট হতে থাকে। তোমার ধারণায় এ হলো বিশৃঙ্খলা। এজন্য এই বিশৃঙ্খলা যত বাড়বে তত লাভ। এক-এর দিকে যত দ্রুত এবং আগ্রহের সাথে এগিয়ে যেতে থাকবে, তত বহুত্বের মধ্যে নতুন ঐক্যের স্তর থেকে আকর্ষণ অনুভূত হবে। দুধের সর খেয়েছ কখনও? আঙুলে তার এক বিন্দু ধ'রে টান দিলে সেই টান সবখানে পৌঁছে যায়। একই ভাবে ঐক্যের স্তর থেকে তোমার যে-কোনো চিন্তা বা অনুভূতিকে টান দিলে অন্য সব চিন্তা বা অনুভূতিতেও জায়গামতো টান পড়ে। এ তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। **বহুত্বের অস্বাস্থ্য মানেই একত্বের স্বাস্থ্য।** সুতরাং আগে একটা ধ্যান কর। এই Analytical Meditation এর Script-টা নাও। হৃদয় মিলিয়ে পড়। হৃদয় কিন্তু মিলানো চাই। হৃদয় মিলাতে গেলে যা ঘটবে তা তো এতক্ষণ বলেছি। তোমার অবস্থা যখন হাসপাতালের জন্য লাভজনক হবে, তখন পরবর্তী ওষুধটা দেব। রোগকে না জেনে ওষুধ দেয়া যায় না। আর রোগকে না জাগিয়ে তাকে জানা যায় না। তোমার অন্তরের ব্যাধি বেড়ে যাক। ওষুধ বেঁচে বহু দিন পয়সা কামাই না। ব্যবসা ভালো হচ্ছে না।'

www.pathagar.com

ছয়. বন্ধনের চিত্র

গুরু চ'লে যাবার পর বুড্ডা পড়তে শুরু করল:

মুক্তির শেকল

মুক্তি!
আমি মুক্তি চাই।
কিন্তু আমার বাক্য এখনও ঠিক হয়নি।
আমি বলছি যে আমি মুক্তি চাই।
নাকি আমিত্ব মুক্তি চায়?
আমিত্ব মানেই কি মুক্তি?
তা যদি হবে, তাহলে সে কেন মুক্তি চাইবে?
যে মুক্ত, তার জন্য মুক্তি কামনাই তার বন্ধন—
কারণ সে কেবলমাত্র তার কামনাটুকুর হাতেই বন্দি।
কামনার তাড়না তাকে কষ্ট দেয়।
তাহলে আমিত্ব মানেই কি বন্ধন?
তা না হলে কেন সে মুক্তি চাইবে?
কিন্তু মুক্তি কি তার কাছে আসবে দূর কোথাও থেকে?
তাহলে তো মুক্তি ঢুকে পড়বে বন্ধনের মধ্যে
এবং তার নামই দাসত্ব—
ঠিক এই মুহূর্তে তো আমার অবস্থা তাই।
মুক্তি কি আসবে তার ভেতর থেকে?
তাহলে তো তার আসারই দরকার নেই
মুক্তি যার ভেতরে আছে সে তো মুক্তই।

কে তাহলে এই আমিত্ব?

www.pathagar.com

সুতরাং প্রশ্নটাকেই ভাসিয়ে দিলাম স্রোতে।
কিন্তু প্রশ্নটাকে স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে
নিজেই
তার পিছু পিছু ভেসে চলার মানে কি?
তার মানে কি উত্তর খোঁজা?
অবশ্যই নয়।
তার মানে হলো এক প্রশ্নকেই বারবার খোঁজা।
এই ব্যাধিটাই তো আমাকে শেকল পরিয়েছে।
সুতরাং প্রশ্নটাকে জলে ডুবিয়ে দিলাম।
আমাকে এখন জানতে হবে যে আমি নিজেই জল এবং প্রশ্ন তার ঢেউ:
প্রশ্ন আমারই ঢেউ।
সুতরাং আমি প্রশ্নটাকে ভালোবাসি
সাগর কি তার ঢেউকে ভালো না বেসে পারে?
ঢেউ বলে আমি ঢেউ
অথচ সাগর বলে ঢেউও সাগর
সুতরাং আমি ঢেউকে ভালোবাসলেও
তার চূড়ায় চ'ড়ে
নিজের দিকে তাকাব না।

যে যেখানে ব'সে থাকে, তার প্রশ্নগুলোর মধ্যে
সেখানকার মাধ্যাকার্ষণ প্রচ্ছন্ন থাকে।
সেই স্থানের জ্যামিতিক বিন্যাস দ্বারাই
তার ব'সে থাকার ধরণ নির্ধারিত হয়
প্রশ্ন তো আমারই সৃষ্টি
আমি তার জবাব খুঁজি কেন?
আমি নিজেই তো তার জবাব!
সুতরাং আমি প্রশ্নহীন হলাম।
'আমি' বিয়োগ 'প্রশ্ন' সমান 'মুক্তি'!
'আমি' যোগ 'প্রশ্ন' সমান শুধু 'প্রশ্ন'।

আমি আমাকে হারিয়ে ফেলেছি
আমারই স্বেচ্ছাকৃত মনোযোগের মধ্যে।
এই মনোযোগ থেকে মুক্তিই স্বাধীনতা
সুতরাং আমার কোনো প্রশ্ন নেই।
এবং জবাবেরও প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

কিন্তু আমি যদি জবাব হব, তাহলে প্রশ্ন কই?
এভাবে কল্পিত জবাব একটি বাস্তব প্রশ্ন সৃষ্টি করে।
যার শক্তি এত তীব্র হয় যে, তার জবাব
আর খুঁজে পাওয়া যায় না।
এভাবে দেখা যায় যে মুক্তি যাই হোক,
বন্ধন হলো প্রশ্ন।
আমি আমার প্রশ্নের হাতে বন্দী।
আমি যে প্রশ্ন না ক'রে থাকতে পারি না,
এটাই প্রমাণ করে যে প্রশ্নহীন হতে পারাই মুক্তি!
কিন্তু এ তো শুধু বন্ধনের ভাষায় মুক্তির সংজ্ঞা!
তাহলে মুক্তি কী?

মুক্তি হলো সমস্ত সংজ্ঞা থেকে অব্যাহতি।
মুক্তি হলো বন্ধনের চিন্তা থেকে মুক্তি!
মুক্তি হলো চিন্তাহীন শীতল মস্তিষ্ক—
তখন হৃদয় যা করে তা বড় স্বাস্থ্যপ্রদ হয়।
বন্ধন হলো এগোতে না পারার গ্লানি
আর মুক্তি হলো এগোনোর প্রয়োজন থেকে মুক্তি!
কারণ তখন এগিয়ে-যাওয়াটা ঘটে স্বাভাবিকভাবেই।

তাহলে কি আমি পিছোব?
কিন্তু কেন আবার এই প্রশ্ন?
কারণ এগোনোর ধারণাটাকে সৃষ্টি করার সাথে সাথে আমি
পিছিয়ে যাবার সম্ভাবনাকে বিশ্বাসে ধ'রে নিয়েছিলাম।
ফলে আমি যখন নিজের সামনে কাঁটা পুতি,
তখন পেছনের খোলা রাস্তা আমাকে প্রশ্ন শেখায়।
সুতরাং আমাকে জানতে হবে যে আমি
স্থানের জ্যামিতি দ্বারা সংজ্ঞায়িত নই।
মুক্তি যদি গতি হবে, তাহলে তো
তারই নাম অনিয়ন্ত্রিত বন্ধন:
গতি মানেই তো চলতে বাধ্য হওয়া।
আমার প্রশ্নগুলো গতিশীল বলেই তো তারা আমাকে ক্লান্ত করছে।
ফলে আমি খুঁজে ফিরছি মুক্তি।
কিন্তু খুঁজতেই যখন হলো,
তখন আর মুক্তি মিলবে কিভাবে?

www.pathagar.com

যাকে খুঁজে পাবার প্রয়োজন হয়, তাকে পেলেও বড় ক্ষতি:
কারণ পাবার সময় থেকেই তাকে হারাবার ভয়টাই
বড় বন্ধন হিসেবে কাজ করবে।
এবং যা পাওয়া যায়, তা হারানোও যায়।
যা হারানো যায়, আমি তা চাই না।
সুতরাং মুক্তি কখনও কোনো খুঁজে পাওয়ার জিনিস হতে পারে না।
সুতরাং এমন মুক্তি আমি চাই না যা পাওয়া যায় এবং হারানো যায়।
আমি এমন মুক্তি চাই যা ছিল আছে থাকবে
যাকে বলে চিরমুক্তি।
কিন্তু আমি 'চাই' বলছি কেন?
চাইলেই তো তা পাব
পেলে আবারও হারাব
হারালে পাবার জন্য আবারও ব্যাকুল হব
এটাই তো পরাধীনতা
সুতরাং 'চাওয়া' মানে কী তা জানতে হবে।
অর্থাৎ আপাতাত আমি মুক্তি চাই না।

কিন্তু 'চাই না' মানে পিছন দিকে ফিরে আসা।
তার নামও তো গতি।
এবং তাও তো একটি যান্ত্রিক বাধ্যতা।
আমি যখন কিছু চাই না, তখন তা থেকে
ফিরে না আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
ফিরে আসা ছাড়া তখন আমার অন্য
কোনো উপায় থাকে না।
'অন্য কোনো' বিকল্প নিয়ে চিন্তা করার
এই বাধ্যতাই আমার শেকল।
মুক্তি মানে এমন অবস্থা
যখন 'অন্য কিছুর' চিন্তাও করার দরকার হয় না
তার অস্তিত্বও আর থাকে না
আমি এভাবে কিভাবে পাব মুক্তি?
সুতরাং ফিরে আসার মধ্যে মুক্তি নেই।
গ্রহণ যেমন সাময়িক—
কারণ তাকে পরে কখনও ত্যাগ করা লাগবে
কিংবা হারাতে হবে—
তেমনি ত্যাগও সাময়িক,

www.pathagar.com

কারণ কেবল তাকেই ত্যাগ করা যায়
যা আমি আগে কখনও
গ্রহণ করেছিলাম।
এবং এখন যা ত্যাগ করলাম
ভবিষ্যতে কখনও তা আবার গ্রহণ করা লাগবে, কিংবা
গ্রহণ না করাকে বহাল রাখার জন্য
চেষ্টা করা লাগবে।
সুতরাং গ্রহণ বর্জন কোনোটাতেই
মুক্তি নেই।

কিন্তু তবুও আমি যে মুক্তি চাই!
অদ্ভুত!
আমি শুধু মুক্তি চেয়েই যাচ্ছি।
অথচ 'আমি যে মুক্তি চাইতে বাধ্য হচ্ছি'
এই ব্যাপারটা নিয়ে অবাক হচ্ছি না।
আমার এই মুক্তি কামনার বাধ্যতা কি
আমার বন্ধন নয়?
হ্যাঁ। এজন্যই তো মুক্তি কামনা করছি আমি।
যেন তা এমনভাবে 'পেয়ে' যাই
যে তা আর কামনা করা না লাগে।
কিন্তু 'পাবার' অস্থায়িত্বও যে একটি বন্ধন
তা তো আমি জেনেই ফেলেছি।
তাহলে কি আমার মুক্তি নেই?

কিন্তু আবারও প্রশ্ন!
আমি একই প্রশ্নে আটকে আছি বিভিন্নভাবে
বিভিন্ন জায়াগায়—বিভিন্ন সময়ে।
অথচ কেউ এক কথা বারবার বললে
তা আমি সহ্য করতে পারি না।
একটা বইতে কেউ এক কথা বারবার
লিখলে আমি লেখককে গাল দেই।
এক খাবার আমার বেশিদিন
ভালো লাগে না।
এক স্ত্রী/স্বামী আমার বেশিদিন
ভালো লাগে না।

www.pathagar.com

অথচ আমি যে লক্ষ লক্ষ বার শুধু
একটাই কথা উচ্চারণ করছি—'ভালো লাগে না'
—এ আমার ভালো লাগছে কেন?

আসলে এই কথাটা বারবার বলতে
ভালোলাগছে না বলেই তো আমি
তা আর বলতে চাচ্ছি না।
এই না-চাওয়ার মধ্যেই তো আমার
মুক্তির প্রতিশ্রুতি লুকিয়ে আছে।
কিন্তু চাওয়া এবং না-চাওয়ার
বাধ্যতা কোনোটাতেই মুক্তি নেই।
তাহলে এখন কী করি?

মুক্তি মানে এক।
ঐক্য।
আল্লাহর তাওহীদ বা ঐক্যে বিলীন হওয়া।
তাহলে কেন এক প্রশ্নকে আমি বারবার একঘেয়েমি বলছি?
তাহলে কেন আমি এক কষ্টকে বারবার তাড়াচ্ছি?
গ্রহণ ক'রে নিলেই তো হলো।
ভিক্ষুককে ভিক্ষা একটু বেশি ক'রে দিলে তো
সে বারবার দরোজায় হানা দেবে না।
কেন যে আমি কোরবানি শিখিনি।
আমি খুশি মনে প্রশ্নকে আলিঙ্গন করলাম।
আলিঙ্গন-বদ্ধ প্রশ্ন নিজেই নিজের জবাব।
অতএব আমি একঘেয়েমিকে চুম্বন করলাম।
চুম্বন-সিক্ত একঘেয়েমি মানেই ধৈর্য—
আর ধৈর্য মানেই শক্তি।
কিন্তু শক্তির ভার সহ্য করাও তো কষ্টকর।
তবুও আমি এক কষ্টকে বারবার ফিরিয়ে দিয়ে
তাকে বারবার আসার সুযোগ ক'রে দেব না।
আমি দরোজা খুলে দিলাম।
যত কষ্টেরা আসবে আমার বিছানায়
আমার সাথে শুয়ে থাকুক।
আরও যদি আসে—আসুক।
আরো।

www.pathagar.com

কিন্তু আমি এক কষ্টকে দুবার আসতে দেব না।
কারণ আমি তাকে ফিরে যেতে দেব না।
তারপর আরো আসে যদি—আসুক।
আমি দরোজাটাই ভেঙে ফেলব।
আমার দরোজার প্রয়োজন নেই।
তারপর আমি ঘর ভেঙে ফেলব।
আমার ঘরের প্রয়োজন নেই।
আকাশটাই আমার ঘর।
তার মধ্যে বাইরে থেকে কেউ আসে না—
তা থেকে বাইরে কেউ যায় না।
যার 'বাহির' নেই তার 'ভেতরও' নেই।
কিন্তু 'নেই' শব্দটাও একপেশে।
কিছু নেই বললে মন চ'লে যায়
যা আছে তার প্রতি
কিংবা যা থাকার কথা ছিল তার প্রতি
সুতরাং ভেতর-বাহির কিছু নেই—
এই বিবেচনাও আমার নেই;
কিছু আছে কি না আছে—
তা নিয়ে উদ্বেগও আমার নেই
এভাবে আমি দুইটা 'নেই' কে আলিঙ্গণ করলাম
কারণ যার দুইটা 'নেই' আছে তার সবই আছে!
সুতরাং আকাশের মধ্যে কিছু নেই
এবং সবই আছে।
কারণ সেখানে যা আছে তা না গুনে রাখলেও থাকবে।
এবং যেখানে যা নেই তার
কথা ভাবার দরকারও হবে না।
কারণ যে আমার ভাবনার ও গণনার ওপর নির্ভরশীল নয়,
তার কাছে
না-থাকা কথাটার কোনো অর্থ নেই।

কিন্তু আমি যে এত হিসাব করছি
হিসাব করার হাত থেকে রেহাই
পাবার জন্য—এটাই কি বন্দিত্ব নয়?

আবারও একই প্রশ্ন।

www.pathagar.com

'এক' বড় মারাত্মক জিনিস!
আল্লাহ এক।
এজন্য আমি তাঁকে সহ্য করতে পারি না।
তা যদি পারতাম তাহলে আমার অভিধানে
'একঘেয়েমি' শব্দটাই থাকত না।
এক বাবায় আমি বিরক্ত নই কেন?
এক মা কেন চিরকাল মায়ের মতোই থাকে?
এক ভাইকে ত্রিশ বছর পর পড়শি বলি না কেন?
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা নাম কেন ধ'রে রাখি?
এবং এমনকি তাকে সন্তান-স্ত্রীর নামের সাথেও
সেলাই ক'রে দেই?
তখন আমার একঘেয়েমি থাকে কোথায়?
'আমি' শব্দটাকে আমি জীবনে কোটি কোটি বার উচ্চারণ করি।
'আমি' মানে তো কোনো নাম নয়—সর্বনাম
—তবুও তাকে আমি সর্বনাশ বলি না কেন,
যদিও তার কারণেই আমার
জীবনের যাবতীয় সর্বনাশগুলো ঘটে?

আমি প্রশ্ন করতে কেন বাধ্য হই?
—এ নিয়ে কেন আমি প্রশ্ন তুলি না?
প্রশ্নকে কেন নিজের দিকে ঘুরিয়ে দেই না?
কেন প্রশ্ন দ্বারা ধ্বংস করি না প্রশ্নকে?
কেন আমি প্রশ্ন করি?
এবং তা না করতে চাইলে করতে বাধ্য হই?

প্রশ্ন করি ব'লেই উত্তর পাই না।
প্রশ্ন না করতে চাইলে প্রশ্নই আমাকে
নিয়ন্ত্রণ করে।

মানুষ যা ভালোবাসে কেবল তাই করে।
আমি প্রশ্ন করি।
অর্থাৎ আমি প্রশ্নকে ভালোবাসি।
তাহলে কেন আমি তার আঘাতকে কষ্ট বলি?
যাকে আমি ভালোবাসি তাকে কেন কষ্ট বলি?
আমার ভালোবাসার মধ্যেই

www.pathagar.com

ঢুকে গেছে আত্মবিরোধ।
আর এটাই আমার দাসত্বের কারণ।
সুতরাং আমি এখন থেকে
ভালোবাসাকে কষ্ট নামে আখ্যায়িত করব না।
আমি কষ্টকে নতুন ক'রে ভালোবাসতে যাব না—
—কষ্টই আমার ভালোবাসা।

আসলে 'এক' এর রহস্য লুকিয়ে আছে অন্য কোথাও।
যা জানেনি পৃথিবীর কেউ।
এক আমি ছাড়া।
তা আমি এখনই নিজেকে শুনাব।
এ রত্নের মতো সত্য কথাটা বলতে পারার বিনিময়ে
আমি নোবেল পুরস্কার চাই না।
চাওয়া থেকে অব্যাহতিই আমার পুরস্কার।
আমি মুক্তিও চাই না।
কারণ চাওয়ার কষ্টই তো বন্ধন।
এক এর রহস্য জানাই মুক্তি।
এবং রহস্যটা হলো একটি মহামূল্যবান পুরস্কার:

আসলে 'এক' কে মানুষের হৃদয় বারবার গ্রহণ করতে চায় না,
গ্রহণ করতে চায় মাত্র একবার!
হৃদয়ের কাছে এক-এর দাবি একবারই সত্য
এজন্য এক আল্লাহকে একবারের সিদ্ধান্তেই
ভালোবাসতে হয় অনন্তকাল।
অথচ মন হৃদয়ের বিরোধিতা ক'রে
এককেই গ্রহণ করতে চায় বারবার
এক যখন বারবার আসে, তখন তার
নাম হয় একঘেয়েমি।
এক আনন্দ বারবার এলে তাই-ই
কষ্টের কারণ হয়।
এক খাবার কেউ বারবার খেতে চায় না
তা যতই সুস্বাদু হোক।
এক কষ্ট বারবার এলে তা ঘটায়
বিরক্তি—যার নাম বিশৃঙ্খলা।
এক প্রশ্ন বারবার এলে বুঝতে হবে যে

www.pathagar.com

আমি এককে গ্রহণ করিনি—
বরং তাকে কেটে অসংখ্য এক-এ বিভক্ত করেছি
এবং এভাবে শিরক করেছি।
এক উত্তর বারবার চাইলে
বুঝতে হবে যে আমি তার মর্ম বুঝিনি।
এক স্ত্রী/স্বামীতে বারবার বিতৃষ্ণা এলে বুঝতে হবে যে
আমি তার সাথে
একত্ব ঘোষণা করিনি।
একের কষ্টকে আমি বারবার আসতে দিচ্ছি
—এর মানেই হলো আমি আমারই মধ্যে
শতভাগে ভাগ হয়ে গেছি।
আমার উচিৎ কয়েক কোটি মূর্তির পূজা করার পর
একটা ছুরি দিয়ে কয়েক কোটি বার আত্মহত্যা করা,
দোজখে অংশীবাদীরা যা করবে।

নইলে আমার উচিৎ একথা বুঝা যে সুখ-দুঃখ সবই
আমারই সত্তার একত্বের ভিন্ন ভিন্ন দিক।
যার ফলে তাদের কোনোটিকে গ্রহণ
বা কোনোটিকে বর্জন করার কোনো ইচ্ছা
বা অনিচ্ছাই আমার থাকা উচিৎ নয়।
আমি আবার আমাকে গ্রহণ করব কিভাবে?
তার মানে তো এটাই যে আমাকে
প্রথমে নিজেকে হারাতে হবে এবং
তারপর গ্রহণ করতে হবে?
আমি আবার আমাকে বর্জন করব কিভাবে?
তার মানে তো এটাই যে
আমাকে প্রথমে নিজেকে কেটে
খণ্ড খণ্ড করতে হবে এবং পরে তা থেকে
একটা একটা ক'রে আমারই আমিত্বকে
ত্যাগ করতে হবে।

এভাবে এককে একবারের সিদ্ধান্তে
মেনে না নিলে
তা থেকে একেক
জাতীয় উৎপাতের উদ্ভব ঘটে।

www.pathagar.com

কিন্তু এককে নিয়ে এতবার এতভাবে ভাবতে হলে
তাকে আর এক বলি কিভাবে?
হ্যাঁ। এককে এক বলতে পারছি না বলেই তো
এক-এক সময়ে আমার এক-এক ধরণের যন্ত্রণা।
আমি চিন্তা করছি বলেই তো কষ্ট পাচ্ছি!
চিন্তা মানেই এক এর ওপর খণ্ডত্ব আরোপ করা।

সুতরাং আমার ওষুধ হলো বিশ্বাস।
বিশ্বাস হলো মাত্র একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপার।
এ কারণে তা চিন্তাকেও অতিক্রম ক'রে যায়।
যা যাকে অতিক্রম ক'রে যায়
তা তাকে বেঁধে ফেলে।
এবং বন্ধনের কোনো চিহ্নও অবশিষ্ট রাখে না।

কারণ যা অতিক্রমকারী বা Transcendent
তার কোনো চিহ্ন নেই!
তা নিরাকার এবং চিন্তারও অতীত
কারণ তাকে খুঁজে পাওয়ার প্রয়োজন হয় না।
তা ছিল, আছে, থাকবে।

যেহেতু তা খোঁজার দরকার নেই,
সেহেতু তাকে খুঁজে না পেলেও
বলার দরকার নেই যে তা পাইনি।

এভাবে তা তার না-থাকার মধ্যেও আছে।
বিশ্বাস তাই-ই।
কারণ বিশ্বাস তারই সাথে
একাত্ব হয় যাকে তা বিশ্বাস করে।
বিশ্বাস মানে দূর থেকে ছুটে যাওয়া নয়,
বিশ্বাস মানে জ্ঞানের তোয়াক্কা না ক'রেই জানা।
বিশ্বাস মানে অপেক্ষার দূরত্ব ছাড়াই প্রাপ্তি।
বিশ্বাস মানে একথা আবিষ্কার করা যে
আমি যা বিশ্বাস করেছি তা যখন আমি বিশ্বাস করিনি
তখনও ছিল
এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

www.pathagar.com

বিশ্বাস মানে অনুসন্ধান থেকে মুক্তি।
পেলাম কি-না এই যাচাই থেকেও মুক্তি।
কারণ এই যাচাইও একটি অনুসন্ধান মাত্র।
এবং অনুসন্ধান মানেই অপেক্ষা।
অপেক্ষা মানেই ভবিষ্যতের দিকে
সত্যকে ঠেলে দেয়া।
তার মানে হলো একথা মেনে নেয়া
যে সত্য এই মুহূর্তে এখানে নেই।
তার মানে হলো সত্যকে
বিভক্ত করা ও শেরেকি করা।

সুতরাং বিশ্বাস করার
পর আবার খুঁজে দেখার দরকার নেই
আমি বিশ্বাস করলাম কি না।
সবকিছুই আমার সত্তার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা।
সুখ-দুঃখ-রোগ-আরোগ্য-সফলতা-ব্যর্থতা-ভ্রান্তি-জ্ঞান
সবকিছুই ভিন্ন ভিন্ন আয়না
যেগুলি আমাকে ঘিরে আছে
যেন আমি আমারই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব দেখতে পারি
আমি আমাকে ভালোবাসি।
সুতরাং আমি আমাকে বাদ দেব কেন?
আমিই দুঃখ, আমিই সুখ।
আমিত্বকে অস্বীকার করলেই আমিত্বের মধ্যে
আবশ্যিকভাবে দ্বিধার সৃষ্টি হয়।
যার নাম প্রশ্ন।
এই প্রশ্নের পেছনে ছুটলে তা আরো
পাকাপোক্ত হয়ে যায়।
সুতরাং এই প্রশ্নকে একবার আয়না দেখানোই যথেষ্ট।
আমি আমাকে ভালোবাসি।
আমি আমার পূর্ণাঙ্গতাকে ভালোবাসি।
সুখ-দুঃখ উভয়ই অস্থায়ী।
ইন্না মায়াল 'উছরে উছরঅ
সুতরাং আমার মনোযোগ যদি থাকে সুখের প্রতি,
তাহলে দুঃখের কথা না ভেবে থাকা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।
একেই বলে দ্বিধা।

www.pathagar.com

অস্থায়ীকে ভালোবাসলে
এই অবস্থা অনন্তকাল চলতে থাকবে।
সুতরাং সুখ-দুঃখ কোনোটাই
আমার লক্ষ্য নয়।
আমার লক্ষ্য হলো এদের
উৎস।
যা চিরস্থির।
আল্লাহর একত্ব দিয়েই নির্মিত আমার আমিত্বের অখণ্ডত্ব।
সুতরাং সেই একত্বের তরবারি দিয়েই আমি
কেটে ফেলব এই মুক্তির শেকল।
মুক্তিকামনার শেকল।
মুক্তিকামনাই তো বন্ধন!
আমার কোনো মুক্তির প্রয়োজন নেই।
আমি মুক্ত!
'আমি দুঃখকে ভালোবাসি'—একথা বলার স্বাধীনতা আমার রয়েছে
আমার অনুভূতি তা মানুক বা না মানুক
সুতরাং আমি আমার অনুভূতির কবল থেকেও মুক্ত
তাহলে আর বন্ধন কোথায়?
আমি যখন যা তখন তাই।
আমি যখন 'দুঃখ' শব্দটাকে ভালোবাসি
তখন আমি দুঃখ।
আমি যখন 'সুখ' শব্দটাকে ভালোবাসি
তখন আমি সুখ।
আমি যখন যা পাই তা ভালোবাসি।
আমি যা ভালোবাসি তা পাই।
আমি আমার ভালোবাসাকে ভালোবাসি।
আমার ভালোবাসাই আমার দাসত্ব।
আলহামদুলিল্লাহ!!
আমি কোনো চিন্তা ছাড়াই স্বীকার ক'রে নিলাম
আমার উৎসের একত্ব
সুখ-দুঃখ-অপেক্ষা সবই আমি!
সুতরাং কোনো চিন্তা, কোনো বিচার-বশ্লেষণ,
কোনো অপেক্ষা ছাড়াই আমি
স্থির ব'সে রইলাম।
আলহামদুলিল্লাহ!

www.pathagar.com

সাত. মুক্তির প্রথম ফর্মুলা

বুড্ডা এভাবে চিন্তাহীন, দ্বিধাহীন, প্রশ্নহীন হয়ে চুপচাপ তাওহীদের সমতলে ব'সে থাকতে চাইল। কিন্তু মন তা মানতে চায় না। কিন্তু সেও নাছোড়। সে Script টি বারবার প'ড়ে তার সাথে মন মিলাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। ঘণ্টা দেড়েক পর গুরু এলেন—'মনে হচ্ছে ঘরোয়া কষ্টে ভুগছ।'

'আপনি মিথ্যা বলছেন, স্যার। যাঁর মনই নেই তাঁর আবার মনে হচ্ছে কিভাবে। আপনি যা বলেছেন তা আপনার অনুমান নয়, তা সত্য।'

'তুমি কিভাবে বুঝলে আমার মন নেই?'

'মন থাকলে কি আর তার ওপারে কী আছে তা জানতে পারতেন?'

'তুমি আমাকে যে কারণে বড় মনে করছ, সেই একই কারণে তুমিও ক্ষুদ্র নও। নিজেকে ছোট ভেব না। মনের কাছে পরাজয় স্বীকার কর না।

দেখ, পাগল কেন পাগল?

কারণ সে জানে না যে সে পাগল।

বোকা কেন বোকা?

কারণ সে জানে না যে সে বোকা।

পাগল যেই জানে যে সে পাগল, অমনি তার পাগলামি সেরে যায়। একই ভাবে, বোকা যেই তার বোকামিকে ধ'রে ফেলে, অমনি সে বুদ্ধিমান হয়ে যায়। তুমি নিশ্চয়ই এমন মানুষ প্রচুর দেখেছ যারা যুগ যুগ ধ'রে স্বভাবের দাসত্ব ক'রে চলেছে। দীর্ঘ বিশ বছর আগে যাকে গাব গাছের নিচে ব'সে তাস খেলতে দেখেছিলে, হয়তো সে এখনও সেখানে ব'সে তাস খেলছে। যে মহিলাকে রেগে গেলে নির্বোধের এবং অত্যাচারীর মতো আচরণ করতে দেখেছিলে, হয়তো তার এখনও সেই হাল। যাকে এক যুগ আগে ভোঁতামি করতে দেখেছিলে, সে হয়তো এখনও ধারালো হতে পারেনি। অধিকাংশ মানুষ এখনও শুধু আবেগ দ্বারা জীবন যাপন করে। তা থেকে তারা বের হয়ে আসতে পারে না। তাদের আবেগের ঢেউ

www.pathagar.com

তাদেরকে যেদিকে নিয়ে যায় তারাও সেদিকে শেওলার বা কচুরিপানার মতো ভাসতে ভাসতে চলে।

একটা সাধারণ মানুষ মনে করে যে সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কি চমৎকার! সে বিশ্বাস করে না, মনে করে যে সে বিশ্বাস করে। কারণ, তার বিশ্বাস যদি মজবুত হতো, তাহলে সে এমন কিছু কাজ কখনও করতে পারত না যা তাকে করতে দেখা যায়। এমন কিছু কথা সে কখনও বলত না, যা তাকে প্রায়ই বলতে শোনা যায়। সে ভাবে—আমি কি বিশ্বাস করেছি? সে যদি প্রকৃত বিশ্বাসী হতো, তাহলে তার মনে এই প্রশ্নটিই জাগত না। অনেক সময়ে *আরেকটু বেশি* বিশ্বাস করতে হবে কি না তা নিয়ে সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তার নামাজ রোজা তাকে না দেয় সমস্যা না দেয় সমাধান। কিন্তু **একজন প্রকৃত সত্যান্বেষীর নামাজ রোজা প্রথমে তাকে কষ্ট দেয়। তার সাধনা প্রথমে তার মনের অস্থায়ী ভারসাম্যকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। এতে তার মনে এক জাতীয় ব্যাধির সৃষ্টি হয়। তার চোখে তার বিদ্রোহ ধরা পড়ে যায়। এ অবস্থায় বুদ্ধিমানের কাজ হলো মনকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করা, তার সাথে জড়িয়ে পড়া নয়।** তোমার এখন সেই অবস্থা হয়েছে।

তুমি যে তোমার মনকে পর্যবেক্ষণ করতে পারছ, এটাই তো প্রমাণ করে যে তুমি তার ভেতর থেকে তাকে দেখছ না, বাইরে থেকে দেখছ। তুমি যদি তার বাইরে না আসতে পারতে, তাহলে তো তাকে দেখতেই পেতে না। তাহলে তো তার অশোভন কাজকামকে তোমার কাছে আদৌ অশোভন মনে হতো না। সুতরাং তোমার টেনশনের কিছু নেই। বিদ্রোহ যে করছে, সে তুমি নও। সে হলো অতীত। দেহকে তুমি যত প্রশ্রয় দিয়েছ তা তার স্মৃতি। তুমি তার অস্তিত্বের উৎস। তোমাকে ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। তাই সে চ'লে যাবার আগে এমনভাবে লাফালাফি শুরু ক'রে দিয়েছে যে সে এখন তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারছে না।

মন এমন এক বান্ধবী যে যাবার সময়ে দেখা ক'রে যায়, যাবার মুহূর্তটাতে সে তার ভালোবাসার সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু ও কখন যাবে বা না যাবে তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। কারণ, আবারও বলি, যে ছটফট করছে সে তুমি নও—তুমি হলে সেই যে তাকে দেখছে। তুমি ওকে দেখতে থাক। ওর খেলায় জড়িয়ে পড় না। তুমি যদি শুধু দর্শক হয়ে থাক, তাহলে ওর প্রভাব তোমার ওপর পড়বে না। কিন্তু তুমি যদি সার্বক্ষণিকভাবে ওর দিকে চোখ না রাখ, তাহলে তুমি নিজের অজান্তেই ওর খেলার সাথী হয়ে যাবে। তখন তোমার দিগ্‌ভ্রান্তি হবে। আর জেনে রেখ, কঠিন তওবার পর যদি তুমি ছোটখাট ভুলও কর, তাহলে তোমার শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর।

যতবারই মন বিদ্রোহ করবে, ততবারই প্রশ্ন করবে, 'কে বিদ্রোহ করছে?' এই প্রশ্নের জবাব খোঁজার দরকার নেই, কারণ তুমি সে নও যার ব্যাপারে তুমি প্রশ্ন করছ, বরং তুমিই হলে প্রশ্নকারী—প্রশ্ন থেকে উদ্ভূত জ্ঞান তোমার দরকার নয়,

www.pathagar.com

তোমার দরকার প্রশ্নকারীকে চেনা: পরিস্থিতির গোলমালের মধ্যে সে হারিয়ে গেছে ব'লে তাকে চিহ্নিত করার জন্য প্রশ্নের এই ব্যবহার আবশ্যক। তারপর আবারও প্রশ্ন কর—'আমি যে প্রশ্ন করছি, এটাই বা আমি জানছি কিভাবে?' এভাবে তুমি নিজেকে খুঁজে পেলে দ্বিতীয় প্রশ্নকারী হিসেবে। অর্থাৎ তুমি শুধু প্রশ্নের মাধ্যমে মনের উর্ধ্বে উঠে গেলে তা নয়, সেই প্রশ্নেরও উর্ধ্বে উঠে নিজেকে খুঁজে পেলে সেখানে যেখানে কাজ করছে শুধু চেতনা, জ্ঞান নয়। *তুমি যা কিছু থেকে নিজের দূরত্ব সৃষ্টি করতে চাও, তাকে শুধু প্রশ্ন করাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তোমার প্রশ্নের বিষয়বস্তু থাকবে তোমার প্রশ্নের দূরত্বে।* সুতরাং আল্লাহকে প্রশ্ন না ক'রে নিজের মনকে, সন্দেহকে, প্রশ্নকেই প্রশ্ন কর। তাহলে ওদের সাথে তোমার দূরত্ব বাড়তেই থাকবে। মন হলো কল্পনামাত্র। স্বপ্নমাত্র। স্বপ্ন থেকে দূরত্ব মানে তো জাগরণের নৈকট্য, নয় কি?'

'স্যার, মনটাকে স্থির ক'রে রাখছি। কিন্তু তারও ভেতর থেকে সে প্রবলভাবে অপেক্ষা ক'রে থাকছে।'

মনকে যখন তার ছড়ানো ছিটানো অবস্থা থেকে এক স্থানে এনে সংঘবদ্ধ করা হয়, তখন তার প্রবল শক্তি স্বাভাবিকভাবেই তার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। এই ধাবিত হওয়ার নামই *অপেক্ষা*। মনের স্তরে ব'সে সবচেয়ে বড় ইবাদত হলো এই অপেক্ষাকে *গ্রহণ করা*। এজন্য আল্লাহ্ বলেছেন আশা এবং আকাঙ্খার সাথে নামাজ পড়তে। আশা +আকাঙ্খা = অপেক্ষা।

কিন্তু এও আসলে তার এক কৌশল। তুমি অপেক্ষা করছ। তার মানে তুমি ধ'রে নিচ্ছ যে তুমি যা চাচ্ছ তা আছে ভবিষ্যতে। এই চিন্তাটাই তো ভুল! যখন তুমি জেনেই ফেললে যে মনটাই মায়া, তখন তোমার ইবাদতে তাকে ব্যবহারই বা কেন করতে যাবে? বরং প্রশ্ন কর—কে অপেক্ষা করছে? এবং জবাব দাও—যে চিরস্থিরের সঙ্গে এক হয়ে লেগে আছে, তার আবার অপেক্ষা কিসের? সে তো তাঁর সাথেই আছে। সুতরাং যে অপেক্ষা করছে সে মন ছাড়া আর কেউ নয়। যে অস্থায়ী, সে স্থায়ীকে ভবিষ্যতে কোথাও আছে ব'লে মনে করে। কিন্তু আমি আমারই জ্ঞানের ওপারে এক হয়ে বাঁধা পড়ে আছি সেই চিরস্থিরের সাথে। সুতরাং আমার অপেক্ষা কিসের? মুক্তি পাওয়ার জন্য চল্লিশ বছরের সাধনার কী দরকার ? আমি মুক্ত।'

'কিন্তু তখন মন বলছে—তুমি যে মুক্ত তার প্রমাণ কী?'

'আবার তুমি ওর কথায় কান দিচ্ছ? প্রমাণ দাবি করে কে? যার স্থিরতা জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল সে। কিন্তু তোমার প্রকৃত আমিত্ব এমন যাকে জ্ঞান দ্বারা বোঝার ক্ষমতা তোমার মস্তিষ্কের নেই। তুমি জ্ঞানেরও অতীত।'

'মন আবারও বলছে—দেখি তো ভেবে আমি জ্ঞানের অতীত কি না।'

'তাহলে বল—জ্ঞান আমাকে পায় না, এটাই প্রমাণ করে যে আমিই মস্তিষ্কে প্রশ্ন সৃষ্টি করি। অর্থাৎ *আমার প্রশ্নের আমিই উত্তর*। দ্যাট্স্ অল!'

www.pathagar.com

'কিন্তু মন আবারও বলে—তাই কি ?'

'তাহলে বল—**আমি প্রশ্নের পর্যবেক্ষক। *আমার পর্যবেক্ষণই প্রশ্নকে জন্ম দেয়*। গভীর ঘুমে আমি তো নিজের মতো থাকি, কাউকে পর্যবেক্ষণও করি না, তাই কোনো প্রশ্নও সৃষ্টি করি না। আমার প্রশ্ন সৃষ্টি তো আমাকে নিয়েই। তা এজন্যে যে মস্তিষ্ক যেন প্রশ্ন দ্বারা বেছে বেছে আমার পথ খুঁজতে থাকে। সে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমারই অধীন।**'

'কিন্তু চোখ কিছু দেখতে চায়।'

'তুমি দৃষ্টিরও অতীত। একথা প্রমাণ করার জন্যই সে দেখতে চায়। এবং ব্যর্থ হয়। তার ব্যর্থতায় আনন্দ কর এবং বল আলহামদুলিল্লাহ!'

'কিন্তু মন বলছে—শান্তি পাচ্ছি না তো। আনন্দ পাচ্ছি না তো। তৃপ্তি ...'

'ব্যস্! আর দরকার নেই।

আনন্দ পাচ্ছি না তো!

ঠিকই তো। মন তো মোনাফেক।

সে তো তার কাজের পুরস্কার চাবেই। সে তো আনন্দ চাবেই।

এখন তুমি আমাকে বল তুমি কিসের ইবাদত করছ—আনন্দের নাকি একত্বের? তুমি আনন্দের জন্য হাত বাড়াচ্ছ ব'লেই কাতর হচ্ছ। ফলে তুমি প'ড়ে থাকছ নিরানন্দের সাথে। **যা অস্থায়ী তার প্রতি লক্ষ্য করলে নিজেকে মনে হবে অন্য এক অস্থায়ীর কবলে বন্দি।** বল—আমি মনের *নিরানন্দ* নিয়েই ***সন্তুষ্ট***। আনন্দ হলো একটা *অনুভূতি* মাত্র। তা এখন আছে, একটু পরে নেই। কিন্তু ***সন্তুষ্টি*** কোনো অনুভূতি নয়, তা হলো একটা এ্যাটিচিউড, একটা ***দৃষ্টিভঙ্গি***। এটার মূল্যই বড়। এটাই চিরস্থায়ী। **বল—আমি স্বাধীন। মন যাকে কষ্ট বলে তাকে তৃপ্তিকর বলার স্বাধীনতা আমার আছে, সে তা মানুক চাই না মানুক। তার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করার স্বাধীনতা আমার আছে। এটাই তো প্রকৃত স্বাধীনতা।**

বল—আমি একত্বের উপাসক, আনন্দের নয়। একত্ব মানে আনন্দ বেদনা সবকিছুর একত্ব। আমার সার্বিকতার এক দিকে আনন্দ, এক দিকে বেদনা। আমার চোখ যদি শুধু থাকে আনন্দের দিকে, তাহলে তার মানে এই দাড়াঁয় যে আমি ধ'রে নিচ্ছি যে আমি আছি বেদনার ভূমিতে দাঁড়িয়ে। ফলে আমার আকাঙ্খা ছুটে যায় কল্পিত আনন্দের দিকে। এ হলো অপেক্ষা। আমার এই অপেক্ষাই আমার কষ্টকে তৈরি করছে। তখন কষ্ট হয় দ্বিবিধ—অপেক্ষার কষ্ট এবং না পাওয়ার কষ্ট। বল—*আমি কোনো দুঃখকে দূরে ঠেলি না, কোনো আনন্দে জড়িয়ে পড়ি না। এক কষ্টকে আমি যতবার তাড়াব তা ততবার এসে আমাকে কষ্ট দিতে থাকবে*। কষ্টকে দূরে ঠেলা বা আনন্দকে কাছে টানা একই কথা—তার মানে হলো নিজের আমিত্বের *সার্বিকতাকে* অস্বীকার করা। তাওহীদকে অস্বীকার করা। তার নাম স্রেফ শেরেকি। আমি কষ্ট সহ্য করতে না পারলে আল্লাহ্‌র কাছে বারবার

www.pathagar.com

ক্ষমা চাব, ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা চাব, কিন্তু কষ্টকে *অস্বীকার করব না*। আমি কি জানি না ইসলামে আল্লাহর একত্বকে স্বীকৃতি দেয়ার গুরুত্ব কতখানি?

বল—আমার অপেক্ষাকে আমি গ্রহণ করলাম। যা আমি গ্রহণ করলাম তা তো আমার মধ্যেই ঢুকে গেছে। সুতরাং তা আর আমাকে বাইরের দিকে, ভবিষতের দিকে টেনে নেবে কিভাবে?

বল—আমি যে অপেক্ষাকে গিলে খেতে পেরেছি—এর পরও যদি কোনো অপেক্ষা থাকে তাহলে তা তো তাই যা আমি গিলেছি। আমি যা গ্রহণ করেছি তাকে আমি দেখতেই পছন্দ করি। আমি চাই না যে তা হারিয়ে যাক। সুতরাং অপেক্ষার এক-রোখা অনুভূতি আমাকে কষ্ট দেয় না। আলহামদুলিল্লাহ! এই স্বীকৃতি এবং প্রাপ্তিই আমার বর্তমানের পাওনা। ভবিষ্যৎ আমাকে আর কিভাবে সামনে টানবে? মন যে ভবিষ্যতের দিকে ছুটে যাচ্ছে—এটা আমি অনুভব করছি কখন? **এখন**। *এখনকার অনুভূতিকেই আমি বর্তমান বলি। সুতরাং এটাই আমার বর্তমান—এই অনুভূতি*। আমি যে অনুভূতির দিকে তাকিয়ে আছি তা আমাকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে কিভাবে? আমি বর্তমানের স্থির প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছি বলেই তো দেখতে পাচ্ছি যে আশা-আকাঙ্খাগুলো ভবিষ্যতের দিকে ছুটে যাচ্ছে। আমি তো সে নই যে ছুটে যাচ্ছে। আমিই সে যে দেখছে। ***সব দর্শকই বর্তমানের। সব দৃশ্যই অতীতের। সব আকাঙ্খাকারী বর্তমানের। সব আকাঙ্খা ভবিষ্যতের। আমি যদি বর্তমানে না থাকতাম, তাহলে অতীত এবং ভবিষ্যৎ ব'লে সময়ের দুটো দিককে আমি চিহ্নিত করতেই পারতাম না***। আমি শুধু চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হলাম না, আমি অস্বীকার করলাম সব অতীত ও ভবিষ্যৎ। আমি ভবিষ্যৎকে অস্বীকার করলাম—অর্থাৎ বর্তমান থেকে তার দূরত্বকে অস্বীকার করলাম—অর্থাৎ আমি তাকে গ্রহণ ক'রে নিলাম: ভবিষ্যৎকে যে গ্রহণ করেছে তার বর্তমানই তার ভবিষ্যৎ। ফলে আমি চিরবর্তমানের সাথে মিশে গেলাম। আসলে আমি মিশে যাইনি—আমি দেখলাম যে আমি তাঁরই সাথে মিশে ছিলাম আছি থাকব।

বল—অনুভূতি চিন্তা কল্পনা দৃষ্টি কেউই আমিত্বকে পায় না। সুতরাং অনুভূতি আনন্দ এরা আমাকে চেয়ে না পেলে তাতেই আমার রহস্যময়তা প্রমাণিত হয়ে যায়।

আসলে, মনের এই আনন্দপ্রীতির হাত ধ'রেই মানুষ মুক্তির খোঁজে বের হয়। **মানুষ যদি নিরানন্দকে অপছন্দ না করত এবং আনন্দের দিকে না ছুটত, তাহলে সে কখনও তওবা করার ইচ্ছা করতে পারত না, স্থির আনন্দের সন্ধান করত না, সাময়িক আনন্দ নিয়ে তৃপ্ত থাকত।** এ কারণে আনন্দ হলো বহুকালের জন্য তোমার পথ-প্রদর্শক আলোকবর্তিকা। কিন্তু যেই তুমি জেনে ফেললে যে তুমি নিজেই সকল আনন্দ-বেদনার কেন্দ্রে রয়েছ, অমনি তুমি তার হাত ছেড়ে দিলে

www.pathagar.com

এবং মুক্তি পেয়ে গেলে। ***আনন্দের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। মুক্তি মানে মুক্তি খোঁজার জন্য ছটফটানি থেকে মুক্তি।*** **এই অ্যাটিচিউডটাকে গ্রহণ কর—যা আসবে, আসুকঃ আলহামদুলিল্লাহ! যা যাবে, যাকঃ আলহামদুলিল্লাহ! যখন যা করার প্রয়োজন তা করা থেকে যেন বিরত না থাকি, অলসতা না করি**—লা হাও লা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলিয়্যিল 'আজীম। শুধু দুঃখ থেকে মুক্তি চাইলে তুমি অসহায়ের মতো আরো বেশি দুঃখের মধ্যে ডুবে যাবে। সুতরাং আরেকটা analytical meditation এর script দিচ্ছি। মন মিলাও। আমি পরে আসব।'

মুক্তির সন্ধান

আমার দেহ কি মুক্ত?

দেহ যে কারণ ঘটায়, তার ফলভোগ থেকে সে কি রেহাই পাবার ক্ষমতা রাখে?

সে ভুল ক'রে বা অপরাধ ক'রে যে যন্ত্রণা ও ব্যাধি সৃষ্টি করে, তাকে এড়িয়ে চলার স্বাধীনতা কি তার আছে?

নেই।

সুতরাং যে তার নিজস্ব কর্মফলের অধীন, সে মুক্ত নয়।

কর্মফল ছাড়াও দেহ কি মহাজাগতিক বিবর্তন এবং বংশানুক্রমিক পূর্বনির্ধারণ বা তকদীর থেকে মুক্ত? সে কি সময়ের প্রবহমান সাগরে পরিবর্তনশীল ঢেউয়ের মতো নয়?

সুতরাং দেহ কখনও মুক্ত নয়।

সে তার ইচ্ছার হাতে বন্দি।

সে তার চাহিদার হাতে বন্দি।

সে তার চাহিদাপূরণের ক্ষমতার এবং অক্ষমতার ফলশ্রুতির হাতে বন্দি।

সুতরাং সে মুক্ত নয়।

সুতরাং চোখ তার দেখার ইচ্ছার আবশ্যিকতা থেকে মুক্ত নয়।

মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র তার অপেক্ষার আবশ্যিকতার হাতে বন্দি।

স্বাস্থ্য বন্দি সময়, পরিস্থিতি, কর্ম, বংশগতি ও নিয়তির হাতে।

কান তার শ্রবণেচ্ছার উদ্গ্রীবতার কবলে বন্দি।

সুতরাং তারা যে উপায়ে আমার আমিত্বের একত্বের প্রতি পর্যবেক্ষণ-ধর্মী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে, তা তাদের বন্দিদশারই প্রমাণ।

সুতরাং চোখের দেখতে চাওয়ার ইচ্ছার অবিচ্ছিন্নতাই প্রমাণ করে যে সে এমন কোনো পূর্ণাঙ্গতার মুখোমুখি হয়েছে যাঁকে তাঁর ঐক্যে চিত্রায়িত করার দক্ষতা তার নেই।

www.pathagar.com

সুতরাং তাকে ঠেকাতে যাওয়া মানেও হলো নিজেকে এমন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যার বিচারক হলো সন্দেহ।

সে দেখতে চায়—এবং এভাবে সাক্ষ্য দেয় যে সে যাকে দেখতে চায় সে তার দৃষ্টিক্ষমতার চেয়েও সূক্ষ্ম।

সে যাকে দেখতে চায়, তার উপস্থিতি সত্য না হলে তার দেখার ইচ্ছাটাই তো জাগত না।

সুতরাং যিনি দৃষ্টির অতীত, তিনি সত্য।

সুতরাং আমি সত্য।

এবং সত্য চোখের আপ্রাণ কামনা এবং অপারগতা।

চেতনা যখন মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ ক'রে, তখন মস্তিষ্ক তার অপূর্ণাঙ্গতাটুকুকে পূরণ করে অপেক্ষা দিয়ে। এবং অপেক্ষার কষ্ট থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে সে সৃষ্টি করে প্রশ্ন।

তার সকল প্রশ্ন সত্য।

তার প্রশ্নের ইঙ্গিত আমারই সত্যতার প্রতি।

ফলত আমার আমিত্বের উৎস যিনি, তিনিই মহাসত্য।

তাঁকে জানার আগেই তিনি সত্য।

চিন্তার আগেই তিনি সত্য।

কল্পনার আগেই তিনি সত্য।

সৃষ্টির জন্মের আগেই তিনি সত্য।

এ কারণে জ্ঞান, চিন্তা, কল্পনা, ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর রহস্যকে পূর্ণাঙ্গভাবে আয়ত্ত্ব করা যায় না।

আমি যখন আমার চেতনার স্তর থেকে তাকাই তখন আমি আমার চোখকেও দেখি।

চোখ কিভাবে দেখে তা আমি দেখি।

আমি তাকাই চোখেরও পেছন থেকে, ফলে আমি বস্তু এবং দেহ দেখি না, দেখি ঐক্য।

দেহ স্বাধীন নয়।

দেহ যে স্বাধীন নয়, এই ঘোষণা কার?

www.pathagar.com

দেহের নয়, আমার।
যে স্বাধীন নয়, পরাধীনতা সম্বন্ধে তার কোনো ঘোষণাই থাকতে পারে না।
পরাধীনতা কোনো ঘোষণার ব্যাপার নয়; ঘোষণার গুরুত্ব পায় কেবল স্বাধীনতা।
পৃথিবীতে কোনো কালে কেউ কি কখনও নিজের পরাধীনতাকে ঘোষণা করতে চেয়েছে?
সুতরাং স্বাধীনতার ঘোষণা করার ক্ষমতা যার আছে, সে অবশ্যই সেই দলভুক্ত নয় যাদের বিরুদ্ধে তার এই ঘোষণা।

সুতরাং আমি দেহ নই।
আমিত্ব মানে দেহ নয়
আমিত্ব মানে দেহকেন্দ্রিকতা নয়
আমিত্ব মানে দেহনির্ভরতা নয়
ভুলক্রমে আমিত্ব বন্দি হয়েছে দেহের কারাগারে

কারণ আমিত্ব বন্দি হয়েছে নিজস্ব স্বাধীনতার হাতে
স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমিত্বের ধারণার ভ্রান্তির হাতে

আমিই আমিত্ব
আমিই স্বাধীনতা
সুতরাং স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার
ধারণার ভ্রান্তির পরাধীনতা আমার পছন্দ নয়
আমি সেই যে দেহের স্বাধীনতা ও
পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতে পারে।
সুতরাং আমি দেহের পূজা করি না।
দায়িত্বপালনে আমি তাকে
সুষ্ঠরূপে ব্যবহার করতেও কার্পণ্য করি না।
আমি মুক্ত।
দেহের কী হলো না হলো তাতে
আমার কিছু আসে যায় না।

যে নিয়তির অধীন, তাকে নিয়ে আমি আলোচনা করতে পারি।
সুতরাং আমি নিয়তির অধীন নই।

আমিত্ব একটি নৈর্ব্যক্তিক বৃত্তীয়তা
একটি গাণিতিক অস্তিত্ব

www.pathagar.com

একটি চেতনার সামগ্রিকতা

মন কী?
আমিত্ব যখন নিজেকে দেখাতে গিয়ে ভুল ক'রে দেহকে দেখিয়ে দেয়, তখন তাতে যে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, তাকে বলে মন।
সুতরাং তা নেই।
তা আছে ততক্ষণ যতক্ষণ ভ্রান্তি আছে

আমিত্ব যখন দেহের বিধানের মধ্য দিয়ে নিজের দিকে তাকায়, তখন তা নিজের সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেয়, তাকে বলে মন।

যা বর্ণনার অতীত, তাকে বর্ণনার সীমিত ছকে আবদ্ধ করলে যে গল্প তৈরি হয়, তাকে বলে মন।

সুতরাং তা আছে —শর্তসাপেক্ষে।
তাই তার মধ্য দিয়ে বাস্তবতাকে দেখলে দেখা যায় যে তাতে অনেক দুঃখ আছে।
যে দেখে, সে মুক্ত, স্বাধীন।
কিন্তু যার মধ্য দিয়ে সে দেখে তাকে
সৃষ্টি করা হয়েছিল নিয়মের ছকে।

নিয়ম মানেই ছক-বদ্ধ স্বাধীনতা।

বস্তু নিয়মের অধীন।
কিন্তু চেতনা মুক্ত।
কারণ চেতনা নিজেই নিয়ম।

ফলে বস্তুর দেহের মধ্য দিয়ে চেতনার প্রকাশ ঘটে আবেগ আকারে। আবেগ অস্থায়ী। ফলে অস্থায়ী নিয়মের দ্বারা তাকে চালিত করলে যে ফলশ্রুতি হয়, তা মায়ামাত্র। কিন্তু তাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা হয় *স্থায়ী নিয়ম দ্বারা*, তাহলে তা সত্যের সান্নিধ্যে সৃষ্টি করে স্থায়ী আমিত্ব।
এই আমিত্ব পরকালে মুক্তি এবং নেয়ামত
লাভ করবে।
একে তৈরি করার জন্যই মানুষকে পৃথিবীতে
পাঠানো হয়েছে।

www.pathagar.com

কিন্তু আমিত্বকে চেতনার আলোয় ধুয়ে দিতে পারলে
মুক্তি মেলে এখানেই।
সেকেন্ডের সিদ্ধান্তেই।

আমি কে?
দেহ মন উভয়ের স্বাধীনতা নিয়ে যে প্রশ্ন
তুলতে পারে, সেই-ই আমি।

সুতরাং আমার প্রশ্ন আমারই সত্যতার প্রমাণ।
আমার প্রশ্ন আমারই স্বাধীনতার প্রমাণ।

সুতরাং আমার প্রশ্নে আমি বিরক্ত নই।
কলসির ওপর সাগর ঢেলে দিলে কলসি তো
উপচে পড়বেই।
আসলে উপচে পড়ে সাগর নিজেই।

মনের ওপর চেতনা যখন নিজেকে ঢেলে দেয়,
তখন যা উপচে পড়ে তার নাম প্রশ্ন।
আসলে তা ঘটে চেতনার তরফ থেকে।
অথচ মন সেই প্রশ্নের মালিকানা দাবি করে।
কারণ সে অস্বীকার করতে চায় যে
সে প্রশ্নের অধীন।
সে বলতে চায় যে সেই প্রশ্নের স্রষ্টা
কলসি বলতে চায় যে সেই সাগরকে উপচে দিয়েছে
মন তার ক্ষুদ্রত্বকে ধ'রে রাখতে চায়
বিস্তৃত হয়ে পড়লে যার অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে,
তার আত্মরক্ষার উপায়ই হলো
সংকীর্ণতার পক্ষে তত্ত্ব সৃষ্টি করা।

কিন্তু সাগর কখনও শত লক্ষ ঢেউয়ের অস্তিত্ব নিয়ে
অভিযোগ তোলে না।
সাগর নিজেকে ঢেলে দেয় ঢেউয়ের কলসির ওপর
তার ফলে ঢেউ থেকে উপচে পড়ে বিশাল এক সাগর
এবং তখন একটা প্রশ্ন সৃষ্টি হয় ঢেউয়েরই চূড়ায়।

www.pathagar.com

আমিই সাগর।
দেহ-মন ঢেউ মাত্র তার।

চেতনার অসীম বৃত্তের নাম আমিত্ব।
ফলে আমিত্ব মানে আত্মচেতনা।
এই বৃত্তের কেন্দ্র হলো মহাচেতনা:
সকল আমিত্ব, জ্ঞান, প্রেমের উৎস।

সুতরাং আমি মুক্ত।
আল্লাহ হলেন আমার মুক্তিদাতা।
তিনিই আমার মুক্তি।
আমি মুক্ত থাকব নাকি বন্দি হব
—এই সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতাও আমার রয়েছে।
ফলে আমার স্বাধীনতাই আমার বন্ধন
হতে পারে—যদি আমি ভুল সিদ্ধান্ত নিই।

এ কারণে আমি স্বাধীনতার দাবিও ত্যাগ করলাম।

যিনি চিরস্বাধীন,
তাঁর পরাধীনতা স্বীকার করার ক্ষেত্রে
আমি আমার স্বাধীনতাকে
ব্যবহার করলাম।
তিনি আমাকে যেভাবে চালান,
যা দেন, আমার কাছ থেকে যা নেন, তাতে
আমার কোনো আপত্তি নেই।
প্রশ্নহীন অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।
কারণ তখন 'আমি' কি আসলেই স্বাধীন?
এই প্রশ্নটারও আর দরকার হয় না।
এবং 'আমি কি পরাধীন?'
এই প্রশ্নটা সৃষ্টি করার স্বাধীনতাও
তখন আর থাকে না।

আমি স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা খুঁজছি
তাহলে আর খোঁজারই দরকারই কী?
খোঁজার প্রচেষ্টাই তো বন্ধন।

www.pathagar.com

আমি যে-অবস্থায়ই আছি, তা আমার জন্য সঠিক
আল্‌হামদুলিল্লাহ!

আমার কোনো অভিযোগ নেই।
এই কথাটা বলার তৌফিক হয়েছে ব'লে আল্‌হামদুলিল্লাহ!
আত্মসমর্পণই স্বাধীনতা।

আমি এখন উঠে একটু হেঁটে বেড়াব
এবং দেহ-মনের সমস্ত ভার বইতে বইতেও আমি জানব
যে আমি স্বাধীন।
আমার প্রভুর যে-কোনো ব্যবস্থা মেনে নেয়ার স্বাধীনতা
আমার রয়েছে।
এই 'মেনে নেয়ার' জন্যই আমি ব্যয় ক'রে ফেললাম
স্বাধীনতার সবটুকু শক্তি।
সুতরাং এর পর আমি স্বাধীন কি না তা নিয়ে
আমার আর চিন্তা করারও দরকার নেই।

বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন—বিশ্বাস হলো
এমন মনোনিবেশ বা কনসেনট্রেশন
যার বাহ্যিক ইঙ্গিত রয়েছে।
চমৎকার বলেছিলেন তিনি।
বাহ্যিক ইঙ্গিত কেন?
যে 'ভেতর' থেকে এই ইঙ্গিত করা হচ্ছে, তা কী?

আসলে একটা বিশেষ সময়ে
মানুষের চিন্তা ও অনুভূতি একটা বৃত্ত রচনা করে।
সুবিধা এবং দক্ষতার প্রয়োজনে মানুষ সেই
মনোকাঠামো থেকে বের হতে চায় না।
চিন্তা ও অনুভূতির যান্ত্রিকতার জন্য সে
তা থেকে বের হতেও পারে না।
তার জ্ঞান দ্বারাই তার নবতর জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি
নির্ধারিত হয়।
ফলে সেই পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে সে
এমন কোনো জ্ঞান অর্জন করতে পারে না
যা তার সঞ্চিত জ্ঞান থেকে গুণগতভাবে আলাদা।

www.pathagar.com

এভাবে সে তার মনোকাঠামোর
অন্ধকূপে ঘুরপাক খেতে থাকে।
যদিও সে ভাবে যে সে ঠিক পথে আছে।
আল্লাহ বলেছেন: শয়তান ওদের কর্মকাণ্ডকে ওদের কাছে শোভনীয় ক'রে রেখেছে।

এ হলো মূল্যবোধ সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে
অকাট্য সত্য কথা।

স্বভাবের দাসত্ব থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা দ্বারা সেই স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ বা অতিক্রম করা যায় না।

কারণ সেই জ্ঞানের রেফারেন্স বা ইঙ্গিত স্বভাবের বৃত্তের বাইরে যেতে পারে না।
মনের এই অন্ধকূপ থেকে বের হওয়া যায়
একমাত্র বিশ্বাস দ্বারাই।
কারণ বিশ্বাসের বাহ্যিক রেফারেন্স সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে।
বিশ্বাসের দ্বারা যে-কোনো ভেতর থেকে যে-কোনো বাইরের দিকে তাকানো সম্ভব।
সুতরাং স্বভাব জ্ঞান কোনোটাই
স্থান-কাল-ঘটনা-ইতিহাসের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

একমাত্র বিশ্বাসই প্রভাবমুক্ত, স্বাধীন।

অথচ অনেক দাম্ভিক জ্ঞানী এবং অজ্ঞ 'উদারপন্থী' জ্ঞানী ভাবে যে তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা দ্বারাই তাদের বিশ্বাসকে গঠন ক'রে নেয়া উচিৎ।
তা কিভাবে সম্ভব?

নৌকা যদি একটা লক্ষ্যকে ঠিক না ক'রে চলতে চলতেই লক্ষ্যকে নির্মাণ করবে ব'লে সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে *লক্ষ্য* শব্দটার মানে কী রইল?

বিশ্বাস হলো সেই দড়ি যাকে আগে লক্ষ্যের সাথে বেঁধে নেয়া হয়।
কিংবা সেই কম্পাস যা দ্বারা আগে লক্ষ্যকে চিনে নেয়া হয়।
দুর্গম পাহাড়ে উঠতে গেলে আরোহীকে তার চেয়েও উপরে দড়ি ফেলার প্রয়োজন হয় যেখানে সে আছে।

www.pathagar.com

জ্ঞান প্রয়োজন লক্ষ্য সঠিক কি-না তা নির্ণয় করার জন্য।
এবং চলার সময়ে সেই লক্ষ্যের দিকে চোখ রাখা চাই।
এই চোখ রাখা মানেই বিশ্বাস।
চলতে চলতে নজর ঠিক করার কোনো মানে হয় না।

সুতরাং জ্ঞান মানেই বিশ্বাস নয়।
তা যদি হয় তাহলে নতুন জ্ঞান দ্বারা পূর্ববর্তী জ্ঞান অপসারিত হলে বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
অপরপক্ষে, বিশ্বাস অজ্ঞতাপ্রসূত নয়।
মন যখন আবশ্যিক প্রশ্নের জবাব পায় না, তখন সে অস্থিরতাপূর্ণ অপেক্ষা সৃষ্টি করে।
এর মানে সন্দেহ নয়।

অজ্ঞতার অস্থিরতাকে সন্দেহ ভেবে কষ্ট পাওয়া অজ্ঞতারই লক্ষণ।
সুতরাং আমি আমার অজ্ঞতার দুর্বলতা দ্বারা আমার বিশ্বাসের তীক্ষ্ণতাকে ভোঁতা করব না।
অজ্ঞতাকে অতিক্রম করার জন্যই তো বিশ্বাস।

জ্ঞানের বৃত্ত এবং জ্ঞানের অনুপস্থিতি
উভয়ই অজ্ঞতা।

অধিকাংশ সময়ে আমার মনে যে দ্বিধা আসে
তা এই অজ্ঞতার বৃত্তের পরিধির স্পন্দনমাত্র।
সুতরাং তা কোনো *অবিশ্বাস* নয়।
বিশ্বাস তো মাত্র একটা সিদ্ধান্তের প্রয়োজন।
বারবার যে অস্থিরতা আসে
তা অবিশ্বাস নয়, অজ্ঞতা।

সুতরাং মন যত দোলে—দুলুক।
আমি তার দুলে ওঠা—দেখছি।
আমি দোলনায় ব'সে কিছু দেখছি না, দূরে ব'সে দোলনাকেই দেখছি।
আল্‌হামদুলিল্লাহ!!

আমি প্রশ্নকে বিশ্বাসের পথের কাঁটা ভাবতে যাব কেন?

www.pathagar.com

প্রশ্নকে ঠেকাতে চায় অজ্ঞ, কূপমণ্ডুক।
আমি প্রশ্নকে গিলে খাই।
প্রশ্ন মানে জবাবের দিকে ছুটে চলা।

আমার বিশ্বাসই আমার জবাব।

সুতরাং মনে যতই প্রশ্ন উঠবে, তার
জবাব আমি জানি।
কারণ অসংখ্য প্রশ্নের সমুখে
আমার একটাই মাত্র বিশ্বাস।
আমার বিশ্বাসই আমার লক্ষ্য
আমার প্রশ্ন আমাকে লক্ষ্যের দিকে
দ্রুত চালিত করবে।

প্রশ্ন মানে গতি।
গতিকে অস্বীকার ক'রে
লক্ষ্যকে কল্পনায় ভালোবেসে কী লাভ?
আমার প্রশ্নের সরলরেখাটা
বিশ্বাসমুখী হয়ে গেছে।
তা বরাবর আমি হেঁটে যাব।
সুতরাং আমার প্রশ্ন শেষ হলেই
গন্তব্য।
এবং গন্তব্যে পৌঁছে গেলেই
প্রশ্ন শেষ হয়ে যাবে।
প্রশ্ন আমার চলার সাথী।
সে এক উদ্যমী, কর্মঠ বন্ধু।
একা একা পথ চলা কঠিন।
আমি প্রশ্নের বাহনে চ'ড়ে পথ চলি।

বিশ্বাস হলো দীর্ঘায়িত স্থিরতা।

অথচ মন মানে হলো অস্থায়ী অস্থিরতা
মনকে যখন স্থায়ী সমতলে লম্বা ক'রে বিছিয়ে দিতে চাওয়া হয়, তখন সে বারবার
কেঁপে কেঁপে তার অস্থায়িত্বরূপ ঘাটতিকে পূরণ করতে চায়।
একে বলা হয় মনের বিদ্রোহ।

www.pathagar.com

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন তো অসহায়।
একথা জানা হয়ে গেলে তাকে করুণা করার প্রয়োজন হয়।
তাকে করুণা করা মানে ছোট-খাট ব্যাপারে তাকে সন্তুষ্ট রাখা এবং একই সাথে বড় ব্যাপারে তাকে একেবারে ব্যবহারই না করা।

আমি মন নই।
আমি মনকে তার পেছন থেকে দেখি।
আমি তার অক্ষমতাকে আমার অবিশ্বাস ভেবে নিজেকে দুর্বল মনে করব না।

মনের ক্ষমতারই যখন আমার প্রয়োজন নেই, তখন তার অক্ষমতাকে গাল দিয়ে কী লাভ।

মন তার ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডিতে অবস্থান ক'রেও আমার বিশালতাকে কামনা করে ব'লে তার অক্ষমতা প্রকাশ হয়ে পড়ে।
এই অক্ষমতাকে সে প্রশ্ন, সন্দেহ, দ্বিধা, এবং বিদ্রোহ আকারে প্রকাশ করে।

মন আত্মবিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হলে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বিদ্রোহ করে।

সুতরাং মন প্রথমত আমার শত্রু নয়।
সে আমার সঙ্গী।
এবং ভৃত্য।
ভৃত্যের সঙ্গ বড় মধুর।
ওমর (রাঃ) তা চমৎকার উপভোগ করতেন।
আমি ওমরকে ভালোবাসি।
সুতরাং আমি ভৃত্যকে ভালোবাসি।
আমি তার অক্ষমতা দিয়ে আমার যোগ্যতার পরিমাপ করি না।
আমি তার অক্ষমতাকে ইঙ্গিত হিসাবে ব্যবহার করি।
এবং প্রয়োজনে তাকে ক্ষমতা দেই।

আমি সাবধানে চিন্তা করি না
সাবধানতা মানে সন্দেহের চোখের সামনে ঘুরাঘুরি করা।
আমি গোপনে চিন্তা করি —
সন্দেহের পেছনে
সন্দেহের ওপাশে

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ এলাকায় ব'সে আমি একাকী চিন্তা করি।

আমার চিন্তার সময়ে আমার সাথে কেউ থাকে না।

কোনো সন্দেহ আমার চিন্তাকে দেখে না।
আমার চিন্তার সাথে আলাপ করে না।

এ কারণে আমার চিন্তার সময়ে কোনো শব্দ হয় না।
আমি বিস্ময়কর নীরবতার মধ্যে চিন্তা করতে পারি।

অর্থাৎ আমি একাকী চিন্তা করি
আমার চিন্তার সময়ে সন্দেহের দ্বিধান্বিত চোখ
আমার দিকে তাকিয়ে থাকে না।
কারণ আমি তার দিকে পেছন থেকে
তাকিয়ে পড়ি
সে আমাকে দেখার আগেই
আমি তাকে দেখে ফেলি

সন্দেহ হলো অন্ধকার
আমার গোপন দৃষ্টি হলো আলো

আলো কিভাবে দেখবে অন্ধকারকে?

সন্দেহের দিকে যখন
আমি একাকী তাকাই
অত্যন্ত গোপনে তাকাই
তখন সৃষ্টি হয় প্রশ্নের
প্রশ্ন হলো অন্ধকার পর্দায় এক বিন্দু তরল
আলো।
তা যখন অনিশ্চয়তায় কাঁপে তখন
তাকে বলে সন্দেহ।
প্রশ্ন যখন প্রশ্নের বিষয়কে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিদ্ধ করে না
তখন তাকে বলে সন্দেহ।
কারণ তখন সে নিজেই কাঁপতে থাকে।

www.pathagar.com

কিন্তু প্রশ্ন যখন মজবুত হয়ে যায়
তখন তার নাম হয় অনুসন্ধান।
অনুসন্ধান শুরু হয় তখনই যখন
সন্দেহ দূর হয়।
যা মিথ্যা তাকে কেউ খোঁজে না

সুতরাং প্রশ্ন হলো তৈলাক্ত অন্ধকার পর্দার ওপর
তরল আলোর বিন্দু।
আমি সে বিন্দুর দিকে তাকালাম।
সুতরাং তার কাঁপা থেমে গেল।
আমি তার দিকে মনোযোগ দিলাম।
সুতরাং ধীরে ধীরে সে আলো প্লাবিত করল
বিপুল পর্দাটাকে।

এবং প্রশ্নবিহীন মুহূর্তের দৃশ্যাবলী মনোরম বটে।
কারণ তখন কোনো দৃশ্য থাকে না।
থাকে শুধু দৃষ্টি।
তখন কোনো দ্রষ্টা থাকে না।
শুধু থাকে দৃষ্টি।

এরকম তখনই হয় যখন চোখের
পেছন চোখের দৃষ্টির দিকে তাকানো হয়।
আমি যখন চোখের পেছন থেকে চোখকে দেখি
তখন চোখেরা দেখতে ভুল করে না।
দর্শক মানে সন্দেহ।
চোখ তার প্রশ্ন।
দৃষ্টি তার জবাব।

সুতরাং চোখের প্রশ্নের জবাবের জন্য
চোখের পেছনে এক ইঞ্চি সরে যাওয়াই যথেষ্ট।

আমি চোখের পেছনে বসবাস করি।
আল্‌হামদুলিল্লাহ!

www.pathagar.com

আমি বাইরের জগতের দিকে তাকাই
দেখি যে এক দিকে আমি আর অন্য দিকে যাবতীয় সৃষ্টি
এক দিকে আমি আর চারপাশে অন্য কেউ
কারণ কাউকেই আমি চিনি না
এখন হঠাৎ ক'রে যদি আমি না থাকি
তাহলে থাকবে শুধু অন্য কেউ
অন্যের মধ্যে আর ভাগ ব'লে কিছু নেই
আছে শুধু এক

অন্যেরা সবাই মিলে অন্য
কারণ তারা সবাই আমার কাছে অপরিচিত

সুতরাং আমার বাহ্যিক দৃষ্টির বিচারে একত্ব আছে দুইবার—
এক আমি এবং *এক* অন্য কেউ
আমি যখন থাকব না, তখন আমার তরফ থেকে
'অন্য' বলার জন্য কে থাকবে?

তখন থাকবে কেউ—শুধু কেউ।
অন্য কেউ থেকে 'কেউ' বাদ দিলে যা থাকে।
অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ এক।

স্বপ্নহীন গভীর ঘুমে আমি না দেখি আমাকে,
না দেখি অন্য কাউকে

আমার দিকে তাকিয়ে চিনতে পারি না কে আমি
তবু শুধু 'আমি'র আঠালো উচ্চারণ দ্বারাই
আমি ভাগ করলাম কাকে যেন
এবং ভাবলাম যে আমি শুধু আমি এবং বাকি সব অন্য
আমি যেমন জানি না কে আমি, তেমনি এই
কল্পিত 'আমি'ও তো জানে না কে অন্য

সুতরাং যে জানে না সে নিজে কে, সে
কিভাবে জানবে তার ভাষায় অন্য ব'লে যা কিছু আছে তা আসলে অন্য কি না?

এখান থেকেই প্রশ্নের সৃষ্টি

www.pathagar.com

প্রশ্নকে ভালো না বাসলে এবং একই সাথে উত্তর না পেলে মনের যে ব্যাধি হয় তাকে বলে সন্দেহ
এবং প্রশ্ন দ্বারা পুলকিত হয়ে সঠিক উত্তরের জন্য
অপেক্ষা না করলে তাকে বলে অহংকার

কল্পিত বিভেদই প্রশ্নের উৎস
চিন্তার প্রথম কাজ হলো ঐক্যের মধ্যে বিভেদ ফুটিয়ে তোলা
এবং এভাবে 'আমি' সৃষ্টি করা
এ হলো দেহকেন্দ্রিক আমি
কারণ চিন্তার যন্ত্রটা থাকে দেহের সাথে

চিন্তার দ্বিতীয় কাজ হলো দৃশ্যমান বিভেদের
ভেতরের ঐক্যের প্রতি তরলের মতো প্রবাহিত হতে থাকা
কারণ চিন্তার ভিত হলো চেতনা, যা সর্বদা ঐক্যপূর্ণ
ফলে তা সর্বদা শূন্যতাকে পূরণ করতে চায়
কিন্তু দেহ-কেন্দ্রিক আশা-আকাঙ্খা চিন্তাকে
বেশিমাত্রায় প্রভাবিত করলে চেতনার সাথে ঐক্য হারিয়ে চিন্তা একটি বৃত্ত রচনা করে
এভাবে সৃষ্ট হয় ভিন্ন ভিন্ন আমিত্ব
ভিন্ন ভিন্ন দেহ
এজন্য বাইরের জগতে সবার আছে ভিন্ন ভিন্ন
ব্যক্তিত্ব, পছন্দ, নিয়ম, ব্যাধি ও স্ত্রী
ভেতরের ঐক্যের দ্বারা বাইরের জগৎ প্লাবিত করলে
কারো স্ত্রী হয়ে যাবে অন্য কারো
এক জনের ব্যাধি পাবে অন্য জনে
অথচ কেউ কারো পছন্দ পাল্টাবে না
সেখানে সবাই ব্যাহ্যিক আমিত্বের ঐক্য পছন্দ করবে
এবং কেউ বলবে না যে-কোনো মা-ই আমার মা
ফলত সৃষ্টি হবে চরম বিশৃঙ্খলার
এ কারণে শরীয়ত এবং ধর্মের বিধান
মানা জরুরি

পার্থক্যের জগতে পার্থক্য রাখতে পারাই
স্বাস্থ্যের লক্ষণ—
এই পার্থক্য সময় এবং স্থানের পার্থক্য

www.pathagar.com

এখানে স্পেস-টাইমটাই বৈচিত্র্যের ফর্মুলার অংশ

কিন্তু *চেতনার* স্তরে দুই ব'লে কিছু নেই
পবিত্রতা অবলম্বন ক'রে বাইরের নিয়ম সুন্দরভাবে রক্ষা করলে
ভেতরটা এমনিতেই ঠিক হয়ে যায়
অপরপক্ষে বাইরের বিধান না মেনে কেবল 'সবকিছু এক' এই চিন্তা করলে
দেহ-দেহ বস্তু-বস্তু এক হতে চায়
কারণ যাবতীয় শক্তি আসে *ঐক্য* থেকে
তখন সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যায়
তখন বল-নাচের আসরে নিজের স্ত্রী এবং অন্যের স্ত্রীর মধ্যে
আর কোনো বিভেদ থাকে না

আবার কঠিনভাবে বাইরের বৈচিত্র্যকে
রক্ষা করার জন্য বিধান মানার সাথে সাথে
কেউ যদি ভেতরের ঐক্যের রহস্য জানতে না পারে,
তাহলেও ঘ'টে যেতে পারে বিপর্যয়
যার নাম কট্টরতা

সুতরাং যখন ঐক্য নিয়ে ভাবব তখন
একেবারে ভেতরের কথা ভাবব—যেখানে দেহ নেই
একেবারে চেতনার কথা ভাবব
এর উপরের স্তরগুলোতে ঐক্য এবং বৈচিত্র্যের
শরীয়ত-নির্দেশিত মিশ্রণ রক্ষা করব

বাইরের জগতে ভেতরের ঐক্য খুঁজতে গেলে
মনে উদিত হয় সন্দেহ ও প্রশ্ন
কারণ প্রত্যেকটা 'আমি' তার পার্থক্যকে রক্ষা করতে চায়
সুতরাং বাঁচার একমাত্র উপায় হলো
প্রশ্ন নিয়ে একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়া
যেন অনুভূতিরা এসে সঠিক চিন্তায় ময়লা না লাগাতে পারে

ভেতরের ঐক্যের টান যখন বাইরে থেকে
প্রথম আকর্ষণ করে, তখন মন প্রথমত জবাব খোঁজে বাইরে
কিন্তু ঐক্য থাকে বৈচিত্র্যের *গভীরে*, বাহ্যিকতার সাথে নয়
ফলত বাইরে তার ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলেই সৃষ্ট হয় প্রশ্ন

www.pathagar.com

এই প্রশ্নের মাধ্যমেই ভেতর টানে বাহিরকে
আত্মিক জগতের ঘটনাটা এমন যে কোথাও থেকে কেউ কোথাও আসেনি
আমি এসেছি ভেতর থেকে বাইরে
অথচ বাইরে আমি দেহকেন্দ্রিক
ফলত একটা দেহের জন্য একটা আমি
'আমি'র উপস্থিতি খুঁজে পায় 'তুমি', 'সে', 'আমরা', ও 'তারা' কে
'আমি'র চোখের সামনে যে আছে সে হলো 'তুমি'
'আমি'র স্মৃতিতে বা চিন্তায় যে আছে সে হলো 'সে'
'আমি' 'তুমি' 'সে'—এখান থেকে যে কেউ ভেতরে ডুব দিলে দেখবে আমি
সুতরাং এখানে আমি যদি তোমাকে এবং তাকে সাধ্যমতো ভালো না বাসি,
তাহলে পরকালে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হব আমি
আমি হারাব আমাকে
আমি খণ্ডিত করব আমাকে
আমি তখনকার মুহূর্তে যে-ভেতরকে পাইনি,
তা হবে আমার জন্য আগুন

ভেতরের 'আমি'কে নিয়ে চিন্তা করারই
কোনো দরকার নেই
তা কোনো চিন্তারই বিষয় নয়
চিন্তা দিয়ে সেখানে যারা পৌঁছাতে চায়
তারা কুৎসিত যৌনতার ডাস্টবিনের মধ্যে
হুমড়ি খেয়ে পড়ে—
মূলত তা হলো দেহ-মন উভয়ের অতীত
সেখানে পৌঁছাতে হলে চাই আত্মনিয়ন্ত্রণ
এবং কোরবানি
এবং তা সেকেন্ডের ব্যাপার মাত্র
যদি ত্যাগ করা যায় আমিত্ব
যদি 'আমি' শব্দটাকেই ভুলে থাকা যায়
এক সেকেন্ডের জন্য

সুতরাং আসল সমস্যাটা দেহটাকে নিয়ে
গোটা মহাবিশ্বে আমার শত্রু ব'লে কেউ নেই
আমার দেহটা ছাড়া

আমার প্রতিবেশি অনাহারী?

www.pathagar.com

বেশ তো—আমি না খেয়ে বা কম খেয়ে তাকে
কেন দিচ্ছি না?
কারণ আমার দেহ দিতে চাচ্ছে না
আমার ঘরে দারিদ্র্য?
বেশ তো—আমি অলসতার মাধ্যমে দেহপূজা না ক'রে আরো বেশি পরিশ্রম করার সাথে সাথে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখছি না কেন?
আমার সমাজে অনাচার?
আমি তো তার প্রতিবাদ করছি না আমার দেহটা
বা তার একটা ডাল-পালা হারাবার ভয়ে

মুক্তি এক সেকেন্ডের ব্যাপার—তবুও হচ্ছে না কেন?
কারণ আমি তো আত্মসমর্পণ করছি না
দেহটা হারাবার ভয়ে
আমি তো অনন্তকালের তওবা এবং
চিরকালের আফসোসহীনতা দ্বারা নিজেকে হত্যা করছি না
সুতরাং আমার একমাত্র শত্রু আমার দেহটা
আমি যখন রেগে যাই-তখন তো তা করি
কেবল দেহটাকেই রক্ষা করার জন্য
আমি যখন লোভাতুর হই—তখন তো
দেহটাকেই পুজো করি
আমি যখন নেশা করি—তখন তো
দেহের মধ্যেই মনটা হারাতে চাই
আমি যখন হিংসা করি—তখন তো
তা করি এজন্য যে আমি অন্য দেহকে আমার
প্রতিদ্বন্দী মনে করি
সুতরাং সাধকের প্রথম কাজ হলো দেহ
ঠিক করা
আমি কোনো দেহ নই।
দেহ আমার গাড়ি, আমি তার চালক।
তাকে প্রয়োজনমতো তেল যোগান দিয়ে আমি চালিয়ে যাব গাড়ি—সোজা গন্তব্যের দিকে।
ইনশাল্লাহ্!

www.pathagar.com

আট. মুক্তির ভয় এবং ভয়ের মুক্তি

ধ্যানের পর বুড্ডার কাছে মনে হলো তার দেহের সমস্ত শিরায় শিরায় টান পড়ছে। তার মধ্যেই মনে এক জাতীয় স্থিরতা আসতে চাচ্ছে কিন্তু তার পরেও তার মনে হচ্ছে মনটা যেন একটামাত্র দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে থাকা এক দড়াবাজিকর—সে এদিক ওদিক দুদিকেই দোলে, অথচ তাকে সামনে হেঁটে যেতে হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা যা হয় তা হলো ভয়। সে মনটাকে যেই স্থির রাখার দায়িত্ব দিয়ে দেহের ভেতরে প্রবেশ করতে যায়, অমনি সে ভয় দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

গুরু ফিরে এলে সে তাঁকে ব্যাপারটা বলল। তিনি জবাব দিলেন—'ভয় একটা তীব্র শক্তির উৎস। এ নিয়ে ছোট একটা পুস্তিকা লিখেছিলাম একবার, আধ্যাত্মিক শিক্ষার্থীদের জন্য। এই নাও, পড়।'

বুড্ডা পড়তে শুরু করল।

ভয়: ভয়ের তীব্র শক্তি এবং তার সদ্ব্যবহার

ভূমিকা:-

মানব মনের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের মূলে রয়েছে যে অত্যন্ত শক্তিশালী আবেগটি তার নাম ভয় (fear)। একমাত্র ভয়ই পারে মানুষকে ধ্বংস করতে এবং বাঁচাতে!

মনের যত ধরনের ব্যাধি ও কষ্ট থাকতে পারে, তা আসে **একমাত্র** ভয় থেকে। ভয়কে অতিক্রম করতে পারলে মনের মধ্যে বা মনকে অতিক্রম ক'রে চিরসুখের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

আবার মনের যত ধরনের ধ্বংসাত্মক দিক আছে—যেগুলো শুধু মনের ভারসাম্য নয়, পরিবার সমাজ, রাষ্ট্র তথা পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে—তা উদ্ভূত হয় ভয়ের ***অভাব*** থেকে!

www.pathagar.com

অর্থাৎ সঠিকভাবে ভয়কে ম্যানেজ করতে পারলে এবং কন্ট্রোল করতে পারলে তার শক্তিকে ব্যবহার ক'রে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।

কিন্তু শুধু তত্ত্বকথা নয়, তা হাতে কলমে করতে পারা চাই।

শুধু তাই নয়, এমনভাবে তা করতে হবে যেন নিজের মনের মধ্যেই নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে আমি ভয়ের প্রবল শক্তিকে ব্যবহার করতে পারছি।

ভয়ের শক্তিকে **বিশেষ ধ্যানের মাধ্যমে** সঠিক দিকে পরিচালিত ক'রে তা দ্বারা:

—ভাগ্যকে বদলানো যায়;

—সত্যিকার অর্থে জ্ঞানী হওয়া যায়;

—রোগমুক্ত হওয়া যায়;

—অপরের মনকে প্রভাবিত করা যায়;

—অপরের ভালোবাসা অর্জন করা যায়;

—স্থায়ীভাবে হতাশা সৃষ্টিকারী ভয় থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং মনে প্রশান্তি লাভ করা যায়;

—সংসারে সুখ ও আনন্দের প্লাবন ঘটানো যায়।

যায়, যায়, যায়!

কিন্তু কিভাবে?

ইনশাল্লাহ আমরা এখন তা জানব। তবে তার আগে জেনে নেয়া যাক ভয় কী এবং কেন তা মনে উদিত হয়। কেনই বা তা প্রবল শক্তির আধার এবং কিভাবে? অর্থাৎ তাতে যে বিপুল শক্তি রয়েছে তারই বা প্রমাণ কী?

ভয়ের উৎস

যে কোনো জীবকে আল্লাহ কম-বেশি স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। উদ্দেশ্য—মানুষ যেন দেহের **আবশ্যিক চাহিদা** (Survival needs) (যেমন ক্ষুধা, নিরাপত্তা) এবং **বিকাশের চাহিদা** (Development needs) (যেমন বেড়ে ওঠা, আরো ভালো কিছু করা বা পাওয়া) মিটাতে গিয়ে তার আবেগের শক্তিকে ব্যবহার করতে গিয়ে ভুল করে এবং নিজের ভুল থেকে শেখে।

কিন্তু কেউ তার প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে কোনো কাজ করল। সে ভুল করল। ভুলের ফলশ্রুতি হিসেবে এমন একটি ঘটনার সৃষ্টি হলো যা ঐ ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ।

www.pathagar.com

এখন সে যদি তার কাজের ফলশ্রুতিকে ভয় পায়, তাহলে সে উক্ত ভুল আর দ্বিতীয়বার করবে না। শুধু তাই নয়, সে তার কাজের ফলশ্রুতির আলোকে বাস্তবতা সম্বন্ধে তার পূর্ব ধারণা (preconception), অনুভূতি (perception), এবং বিশ্বাসকে (belief বা assumption) শুধরে নেবে। এভাবে সে উক্ত কাজের ক্ষেত্রে সঠিক পথটাকে (the right course of action) বেছে নেবে। তখন যা ঘটবে তাকে বলে কার্যকর সিদ্ধান্তগ্রহণ (effective decision making)। সিদ্ধান্তগ্রহণ মানে হলো একাধিক বিকল্পপন্থা (alternatives) থেকে শ্রেষ্ঠতম (best) পন্থাটিকে বেছে নেয়া (choosing)। চেষ্টা-ভুলের (trial-and-error) পথ ধ'রে এভাবে সঠিক বা শ্রেষ্ঠতম বিকল্পকে (choice) নির্বাচন করতে গিয়ে বিকশিত হয় বুদ্ধি (intelligence), সৃষ্ট হয় অভিজ্ঞতা (experience), এবং সঞ্চিত হয় জ্ঞান (knowledge)। সৃষ্টিজগতের সব প্রাণীই শিক্ষণের (learning)-এই মৌলিক উপায় অবলম্বন ক'রে শেখে এবং প্রকৃতিতে টিকে থাকে। শিক্ষণের এই চেষ্টা-ভুলের পদ্ধতি নিয়ে শত শত গবেষণা হয়েছে, যার কিছু তো রীতিমতো ঐতিহাসিক উদাহরণে পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে তত্ত্বের মাধ্যমে দাঁড় করেছিলেন মনোবিজ্ঞানী Claparede, Pavlov, Skinner প্রমুখ।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন যে তিনি গোটা জীবজগৎকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে এই চেষ্টা-ভুলের পথ ধ'রে নলেজ ক্রিয়েশন বা জ্ঞান সৃষ্টিতে এবং Intelligence development বা বুদ্ধির বিকাশের সুযোগ দেয়ার জন্য। যেমন নিচের আয়াতটি বিবেচনা করা যাক :

মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে ও স্থলে বিপদ ছড়িয়ে পড়ে, তাই ওদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি ওদেরকে আস্বাদন করানো হয় যাতে ওরা [ভুল বুঝতে পেরে] সঠিক পথে ফিরে আসে। (সূরাঃ রুম, ৪১)

মানুষের প্রাথমিক শিক্ষণও ঘটে ঠিক এভাবে—secondary learning. বা বই পুস্তকের ও কাগজ কলমের মাধ্যমে learning আসে যার পরেঃ

আবৃত্তি করো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। আবৃত্তি

www.pathagar.com

করো, তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। যিনি *কলমের সাহায্যে* শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। বস্তুত মানুষ তো সীমালঙ্ঘণ ক'রেই থাকে।

(সূরাঃ আলাক, ১-৬)

তাহলে দেখা গেল যে টিকে থাকা (survival), জ্ঞান সৃষ্টি (knowledge creation), বুদ্ধির বিকাশ (development of intelligence), এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ (decision making)—সব ক্ষেত্রে ভয় একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের (catalyst) কাজ করে। ভয় না থাকলে মানুষের বিবর্তন (evolution) ও বিকাশ (development) ঘটত না। ভয় না থাকলে মানুষ তার ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত না! ভয় না থাকলে মানুষ সত্যকে খুঁজে পেত না। ভয় না থাকলে মানুষ তার আচরণের বিভিন্ন সম্ভাবনাকে (possibilities) যাচাই করার সুযোগ পেত না। ফলে জ্ঞান ও আচরণে নির্ভুলতা ও বৈচিত্র্যও সৃষ্টি হতো না।

শিশু আগ্রহের দ্বারা চালিত হয়ে আগুন ধরতে যায়। একটু স্যাঁকা খেয়ে সে জানতে পারে আগুন কী। তা সে জানতে পারে ***একমাত্র*** তার ভয়ের কারণে। সে যদি আগুনের স্যাঁকা খেয়েও আগুনকে ভয় না পেত, তাহলে একদিন আগুনই তাকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিত। তখন স্যাঁকা খাওয়ার জ্ঞান তার জীবনের কোনো কাজে লাগত না। প্রকৃতপক্ষে সে আগুনের সেঁকা খাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান লাভ করেছে—এক্ষেত্রে এই কথাটা বলার কোনো অর্থই নেই।

এখানেই রচিত হয়ে যায় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পার্থক্য। সব অভিজ্ঞতাই জ্ঞান নয়। যে অভিজ্ঞতা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা decision making এর ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে কাজ করে না, তা জ্ঞান পদবাচ্য নয়।

সুতরাং ভয় মানব অস্তিত্ব ও বিকাশের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক ও আবশ্যিক উপাদান বটে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন যে তাঁকে ভয় পায় কেবল জ্ঞানীরাই। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেছেন যে, যে আল্লাহকে ভয় পায় না সে একটা আস্ত গাধা । তবে আল্লাহ-ভীতির প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি, ইনশাল্লাহ।

তাহলে দেখা গেল যে ভয় হলো মনের সুস্থতার লক্ষণ। তা মন ও মেধাকে সঠিক পথে চালিত করে। এবং এই ভয়কে যদি সঠিক পথে চালিত করা যায়, তাহলে তা দ্বারা

www.pathagar.com

আসাধ্য সাধন করা যায়। অপরপক্ষে তা যদি ব্যক্তিকে ভুল পথে চালিত করে, তাহলে ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য ।

ভয় হলো **আত্মরক্ষার** (defense) সবচেয়ে প্রাথমিক (primary) এবং শক্তিশালী প্রাকৃতিক (natural) উপায়। সুতরাং ভয় কাউকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করবে কি, তা যদি তার হতাশা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা (anxiety), বিষণ্নতা (gloominess), মনোবৈকল্য (dementia) এবং অন্যান্য মানসিক কষ্ট ও রোগের কারণ হয়, তাহলে সেই রক্ষকের মানে থাকল কী? দারোয়ান যদি ঘর পাহারা দিতে গিয়ে নিজেই চুরি করে, তাহলে দারোয়ান কাকে বলে তা নতুন ক'রে ভাবার দরকার হয় কিংবা ভেবে দেখার দরকার হয় দারোয়ানকে এই সুযোগ কে দিল।

অবশ্য এক্ষেত্রে আমদের দুটি প্রস্তাবনা (proposition) আছে:

● কোনো দারোয়ানকে কমপক্ষে ততটুকু পরিমাণে ক্ষমতা ও শক্তি দিতে হবে যতটুকু থাকলে সে ইচ্ছে করলে গৃহস্থের বাড়িতে ডাকাতি করতে পারবে, এবং

● যে দারোয়ান গৃহস্থের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তার ঘরের সব মূল্যবান দ্রব্য চুরি করতে সক্ষম নয়, তাকে দারোয়ানের চাকরি দেয়া গৃহস্থের পক্ষে আদৌ উচিত নয়; তা বোকামি।

আমাদের প্রথম প্রস্তাবনার পক্ষে যুক্তি হলো এই যে, ঘরের সমস্ত মূল্যবান জিনিস এবং জীবনের মূল্য নির্ভর করছে দারোয়ানের শক্তি-সামর্থ্য, যোগ্যতা, ও বুদ্ধির ওপর। সুতরাং দারোয়ানকে হতে হবে এমন যেন সে ইচ্ছে করলে বা সুযোগ পেলে গৃহস্থেরও ক্ষতি করতে পারে। কেননা গৃহস্থ যদি দারোয়ানের চেয়ে উক্ত কাজে বেশি দক্ষ হতো, তাহলে তো তার দারোয়ানেরই কোনো প্রয়োজন হতো না। ডাকাত যখন কোনো গৃহস্থের বাড়িতে হানা দেয়, তখন সে নিজেকে গৃহস্থের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ব'লে বিশ্বাস করে ব'লেই তা করে। সেই ডাকাতকে প্রতিহত করতে হলে দারোয়ানকে এমন শক্তি দিতে হবে যা গৃহস্থের ধারণা অনুসারে ডাকাতের চেয়েও বেশি।

দ্বিতীয় প্রস্তাবনার পক্ষে আমাদের যুক্তি হলো, যে ব্যক্তি চোর সে চোখের সামনে দিয়ে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা কোনো কাজ করতে আসে না। সে আসে অন্ধকার, অজ্ঞতা, ও অসচেতনতার সুযোগটুকু গ্রহণ করতে। তার মানে হলো এই

www.pathagar.com

যে, চোর অন্য কারো চোখের অন্ধকারকে দেখতে পায়, অন্য কেউ যে বিষয়ে অজ্ঞ বা তথ্যধারী নয় সে বিষয়ে তার কাছে জ্ঞান ও তথ্য রয়েছে এবং অন্য কেউ কোন বিষয়ে জ্ঞানী হয়েও সচেতন নয় তা তার জানা। এই চোরকে হঠাবার জন্য বা ধরার জন্য যে সব গুণাবলী ও যোগ্যতা দরকার, দারোয়ানের তা থাকা চাই।

এখন প্রশ্ন হলো—দারোয়ানেরই বা কেন দরকার?—দারোয়ানের অস্তিত্বই কি প্রমাণ করে না যে গৃহস্থের এমন কিছু অন্ধকার, অজ্ঞতা, ও অসচেতনতা রয়েছে যার সুয়োগ কোনো চোর নিতে চাইবে? তা কি এও প্রমাণ করে না যে গৃহস্থ যে দারোয়ানকে নিয়োগ দিয়েছে তার সেই দুর্বলতাগুলো নেই? এবং ফলে সেই দারোয়ানই ইচ্ছে করলে তার ঘরের সব মূল্যবান জিনিস চুরি করতে পারে?

সুতরাং মসৃণ যুক্তির মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রস্তাবনা দুটিকে প্রমাণ করলাম।

ভয় হলো এমন এক শক্তিশালী দারোয়ান যাকে আল্লাহ দিয়েছেন আমাদের আত্মকে রক্ষা করার জন্য। তা যদি আত্মকে (soul) রক্ষা করতে পারে, তাহলে অস্তিত্ব সম্ভব হয়—ইহকালে ও পরকালে।

কিন্তু এই দারোয়ানের শক্তি এত বেশি ব'লে সে-ই সমস্ত চোর ডাকাতকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই গৃহস্থের ঘর ডাকাতি করে বা চুরি করে। মনের যত ধরনের ব্যাধি এবং অযোগ্যতা আছে, তার সবগুলির সাথেই ভয় জড়িত।

এখন আমরা একটি আত্মবিরোধ পাচ্ছি—দারোয়ান যদি গৃহস্থের চেয়ে শক্তিশালী না হয়, তাহলে সে গৃহস্থের কোনো কাজে লাগবে না; অপরপক্ষে, সে যদি গৃহস্থের চেয়ে শক্তিশালী হয়, তাহলে সে সুযোগ পেলে গৃহস্থেরই ধ্বংসের কারণ হবে। তাহলে ?

এই ধাঁ ধাঁ বা আত্মবিরোধটি এত মৌলিক যে এ সৃষ্টি রহস্যের একেবারে মূলের সাথে জড়িত। এ মানব অস্তিত্বের মূলের সাথে জড়িত। কোনো দার্শনিক বা মনোবিজ্ঞানী এটিকে আবিষ্কার করেছেন কি না তা আমি জানি না, তবে এর সাথে সাধকদের পরিচয় ছিল চিরকালই, যদিও কেউ একে ভাষায় বর্ণনা করেছেন কি না তাও আমার জানা নেই। আমি এর নাম দিয়েছি *The Universal Paradox of Power Management,* কারণ, এটিকে আধুনিক management (organizational management, self-

www.pathagar.com

management, spiritual management) এবং administration এবং leadership (নেতৃত্ব) এর ক্ষেত্রে ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করা যায়। রক্ষকের ক্ষমতায়ন (empowerment) না হলে কাজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায় না, আবার রক্ষক যখন নিজেই ভক্ষক হয় তখন management বা administration অথর্ব হয়ে পড়ে। আমাদের দেশের সরকারী দপ্তরগুলিকে এবং রাজনৈতিক ও অনেক প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের ইমারতগুলিকে ধ্বংস করেছে এই paradox এর ঘুনপোকা। আমাদের দেশকে রক্ষা করার জন্য দেশেরই জনগণ যে সব বাহিনীকে গঠন করেছে, তাদেরই অনেক শাখা দেশটিকে ধ্বংস করছে।

এই যদি হয় বাস্তবতা, তাহলে আত্মরক্ষার উপায় কী? গৃহস্থ যদি হয় দারোয়ানের চেয়ে দুর্বল, তাহলে তার বেচেঁ থাকার উপায় কী? তাকে কি তাহলে দারোয়ানের চেয়ে বেশি ক্ষমতা হাতে রাখতে হবে?

না। এক্ষেত্রে এই প্রশ্নটিই নিরর্থক। কারণ দারোয়ানের ক্ষমতাই গৃহস্থের ক্ষমতা। গৃহস্থ তার ক্ষমতাকে দারোয়ানের মধ্যেমেই ব্যবহার করেন। সুতরাং গৃহস্থকে দারোয়ানকে ম্যানেজ করতে হয় কি ভাবে তা জানতে হবে। যে গৃহস্থ তা জানে না, তার কোনো দারোয়ানেরই দরকার নেই, কারণ তার এমন কোনো মূল্যই নেই যে তাকে আত্মরক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ তার কোনো গুরুত্বই নেই। একথার মধ্যেই নিহিত আছে Power Management এবং Leadership এর মূল Philosophy এবং Psychology।

প্রতিটি সাধককে হতে হয় এই বিচারে সফল ম্যানেজার। যে-কেউ-ই জীবনে সফলতা অর্জন করতে চায়, আবেগ, জীবন, ভাগ্যের এক অংশ সহ সমাজের বিভিন্ন স্ত রের ওপর নেতৃত্বের দক্ষতা অর্জন করতে চায়, তাকেই এই নীতিটি (principle) ভালোভাবে জানতে হবে। নইলে জীবনে ব্যর্থতা অনিবার্য।

ভয় এমন এক শক্তিশালী দারোয়ান যাকে আল্লাহ আমাদের সেবার জন্য আমাদের সাথেই দিয়ে দিয়েছেন। তাকে চাকুরিচ্যুত করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা শুধু তাকে ম্যানেজ করতে পারি। আর সঠিকভাবে তা করতে পারলে আমরা ছিনিয়ে নিতে পারি ইহকাল পরকালের বিজয়। তখন ভয়ই হয়ে ওঠে আমাদের শ্রেষ্ঠ সেবক এবং শক্তি।

আমরা একটু আগে বলেছি যে মন এবং আত্মার যত ব্যাধি আছে, তার সাথে (মৌলিক স্তরে) ভয় জড়িত। একথা

www.pathagar.com

ব্যক্তিমাত্রই নিজের মনের হতাশা ও কষ্টের দিকে তাকালে বুঝতে পারেন। মনোরোগের চিকিৎসকগণ একথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে টের পান, যদিও একই ভয় কিভাবে মনের যাবতীয় আবেগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে তার *ধারাবাহিক* কোনো তত্ত্ব তাদের জানা নেই। এ তাদের দুর্বলতা নয়, কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞান সহ সব empirical science দাঁড়িয়ে আছে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের জ্ঞানের ওপর। আর একথা বিজ্ঞানের দার্শনিকের (Philosopher of science)-এর ভালোভাবে জানা আছে যে পর্যবেক্ষণজাত জ্ঞান সত্য হলেও তা হয়ে থাকে ছাড়া-ছাড়া (discrete)। তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে দরকার হয় বিশ্লেষণ (analysis) এবং সংশ্লেষণ (synthesis) —কিংবা, অন্য কথায়, নির্মাণ (construction) এবং খণ্ডায়ন ও বিশুদ্ধায়ন (deconstruction, reduction, এবং conceptualization)। কিন্তু এগুলো হলো যৌক্তিক-দার্শনিক পদ্ধতি—যার সত্যতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর পর্যবেক্ষণ দ্বারা যাচাই করা যায় না। তাছাড়া **দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ (values) দ্বারা প্রভাবিত। ভিন্ন ভিন্ন বিচারে তাদের সবগুলোই হয়তো সত্য—ভিন্ন ভিন্ন ডাইমেনশনে, কিন্তু তাদের সবগুলোকে এক সমতলে ঐক্যপূর্ণ করেছে যে দর্শন, তাকে আবার ঐ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর কোনো *একটার* মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পাওয়া যায় না। এভাবে বিবর্তন (evolution) হতে থাকে দার্শনিক মতবাদের। এ কারণে বলতে হয় যে, Wittgenstein যথার্থই বলেছিলেন যে, দর্শন কোনো থিওরি নয়, তা হলো যৌক্তিক ক্রিয়াকান্ড (activity) মাত্র** *(Tractatus Logico Philosophicus)*।

যাহোক, আমরা এখন সেই তত্ত্বই উপস্থাপন করব যা হলো প্রকৃত বাস্তবতা—বিজ্ঞান এবং দর্শন নিজ নিজ বিবর্তনের চরমে গিয়ে অবেশেষে যা জানবে (হয়তো সে দিন আর খুব বেশি দূরে নয়!)।

হঠাৎ ক'রে বিজ্ঞ পাঠকের মনে প্রশ্ন জেগেছে—লেখক সাহেব! যা জ্ঞানের বিশুদ্ধ শাখাগুলো এখনও পায়নি, তা আপনি পেলেন কিভাবে? আর কী ভাবেই বা বুঝলেন যে চিন্ত বিজ্ঞান (যেমন দর্শন) এবং ফলিত বিজ্ঞান ঠিক তাই খুঁজে পাবে যা আপনি আগে-ভাগেই ব'লে দিচ্ছেন?

এ প্রশ্নের কোনো বিজ্ঞানসম্মত জবাব দেয়ার চেষ্টা করব না। **বিজ্ঞান পরে কী জানবে তা যদি আগেই *বৈজ্ঞানিক***

www.pathagar.com

পদ্ধতিতে ব'লে দেয়া যেত, তাহলে তো সেই পদ্ধতিটাই হয়ে যেত বিজ্ঞান, এবং ফলে সব বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটত। আমি শুধু এটুকু বলব যে, অন্তত মন যেখানে জড়িত, সেখানে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা তা মন দিয়ে বিচার ক'রেই জানা যায়। মন-সম্পর্কিত আংশিক সত্য মনকে আকৃষ্ট করলেও তা মনকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারে না—প্রশ্ন এবং ব্যাধি রয়েই যায়, অনেক সময়ে বরং বেড়েই যায়, কারণ অর্ধেক-জ্ঞান প্রশ্নের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়ে অথচ জবাবকে রহিত ক'রে দিয়ে মনের মধ্যে অস্থিরতা বাড়িয়ে দেয়। অপরপক্ষে মন-সম্পর্কিত *পূর্ণাঙ্গ সত্য* মনের সাথে *তাৎক্ষণিকভাবে* খাপ খেয়ে যায় এবং তা মনের মধ্যে এই ভরসা বাড়িয়ে দেয় যে তা দ্বারা মনের ব্যাধির পূর্ণাঙ্গ নিরাময় হবে। তা পালন করতে পারা-না-পারার ব্যাপাটার সমস্ত দায়ভার তখন ব্যক্তি পুরোপুরি নিজের ওপরই আরোপ করতে বাধ্য হয়, তত্ত্বকে দোষ দিতে পারে না। চিন্তা ক'রে দেখুন: রসূল (সঃ) বলেছিলেন : শরীয়ত তোমাদেরকে কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিলেও তোমরা তোমাদের বিবেকের কাছেও একবার প্রশ্ন ক'রে নিও। কারণ কী? কারণ সত্যকে—খাঁটি সত্যকে—চেনার মতো ক্ষমতা মনের আছে। তাছাড়া শরীয়তের সবকিছুকে হৃদয়ের মধ্য থেকে পাবার প্রচেষ্টাই মারেফত বা জ্ঞান সৃষ্টি ক'রে। ***মারেফত হলো শরীয়তের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা***। এ কারণে যারা শরীয়ত বাদ দিয়ে মেকি মারেফতের কথা বলে, তাদের কথায় সত্য থাকবে আংশিক, এবং ফলে তা অন্তরের ব্যাধি সারাতে গিয়ে বরং বাড়িয়েই দেবে।

যাহোক, ভয় নিয়ে কিছু exercise করা যাক। বলুন তো 'ভয়' এর বিপরীতার্থক শব্দ (antonym) কী?

অনেকে চট ক'রে জবাব দেবেন—কেন, সাহস।

বেশ, তাহলে সাহসই বা কাকে বলে? একজন ধর্মযোদ্ধার সাহস আছে, সাপুড়ের সাহস আছে, খুনিরও সাহস আছে...ইত্যাদি। তাহলে একই সাহসের ভিন্ন চেহারা পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ এর কোনো একক অর্থ নেই—এ হলো একটা ধারাবাহিক দৈর্ঘ্যচ্ছেদ বা continuum। যেমন :

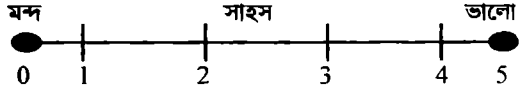

www.pathagar.com

অর্থাৎ সাহসের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় মন্দ ও ভালো মিশ্রিত থাকতে পারে। সুতরাং 'ভয়' এর বিপরীতার্থক শব্দ সাহস নয়। কারণ 'সাহস' কোনো *একক ধারণা* নয়। যাকে বলে concept (বৈজ্ঞানিক ধারণা), তার একটা single meaning বা single set of meanings বা একক অর্থ বা অর্থগুচ্ছ থাকে। সুতরাং, আধ্যাত্মিক বিচারে, সাহস কোনো concept নয়, বরং তা হলো construct বা অর্থ-কাঠামো, যার মধ্যে একাধিক concept এর উপস্থিতি রয়েছে।

আসলে ভয় কাকে বলে তা না জানলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না। কিন্তু আমরা কথা দিয়েছি যে আমরা কিছু exercise করব। সুতরাং তা না ক'রে ভয়ের সংজ্ঞার দিকে যাওয়া যাবে না।

ভয়ের বিপরীত হলো **ত্যাগ**।
ভয়ের বিপরীত হলো **জ্ঞান**।
ভয়ের বিপরীত হলো **অজ্ঞতা**।
ভয়ের বিপরীত হলো **ঝুঁকি-গ্রহণ** (Risk-taking)।
ভয়ের বিপরীত হলো **আত্মবিশ্বাস**।
ভয়ের বিপরীত হলো **আস্থা** (Trust)।
ভয়ের বিপরীত হলো **সততা**।
ভয়ের বিপরীত হলো **বৈরাগ্য**।
ভয়ের বিপরীত হলো **প্রেম**।

হয়তো ইতোমধ্যে আমি কিছু কিছু পাঠকের কাছে আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তবুও আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি না। খোলাসা করছি।

কল্পনা করুন—আপনি এক লাখ টাকা (ধরা যাক যে আপনি কোটিপতি নন, কারণ তখন হয়তো আপনার কাছে এক লাখ টাকাকে তেমন কোনো মূল্যবান কিছু ব'লে মনে হতো না) নিয়ে ঢাকার রাস্তায় রাত নয়টার পর বেবিটেক্সি যোগে কোনো এক 'দূর' থেকে বাসায় ফিরছেন। ভয় হচ্ছে না কি? খালি হাতে এই ভ্রমণটা করার সময়ে কি এই ভয়টা মনে জাগত?

এই ভয় হলো *হারাবার ভয়*। আপনার মনের মধ্যে যদি (কোনো কারণে) আগে থেকে এই নিয়ত থাকত যে আপনি টাকাটা যে চাইবে তাকে দিয়ে দেবেন, তাহলে তখন আর এই ভয়টা মনে উদিতই হতো না। সুতরাং এই ভয়ের উৎস হলো অস্তিত্ব (survival), কারণ আপনার ধারণা আপনার

www.pathagar.com

অস্তিত্বের জন্য টাকাটা আপনার একান্ত দরকার; অথবা এই ভয়ের উৎস হলো অঙ্গীকার (commitment) বা দায়িত্ববোধ (a feeling of responsibility), কারণ হয়তো টাকাটা আপনার নয়, অন্য কারো, যা খোয়া গেলে অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে; অথবা এর উৎস হলো লোভ (greed), কারণ আপনি নিছক লোভবশতই টাকাটাকে আকঁড়ে ধরতে চান...ইত্যাদি। সুতরাং এই ভয়ের বিপরীত হলো **ত্যাগ** (sacrifice), যদি টাকাটা আপনার নিজের হয়: মনে ত্যাগের দৃঢ় ইচ্ছা থাকলে ভয়টাই আর জাগবে না; কিংবা তার বিপরীত হলো...**ত্যাগ**, কারণ অপরের আমানত রক্ষা করতে গিয়ে যদি প্রাণও ত্যাগ করতে হয়, তাহলে তাও করব—এই চিন্তা আপনাকে সাহস যোগাবে। অবশ্য আমরা এই সাহসের কথা ঠিক এই মুহূর্তে বলছি না। ফলে এরূপ ভয়ের বিপরীত হলো... **সাবধানতা** (caution)।

অনেকে—বিশেষত অল্প-জ্ঞানী নাস্তিকরা, ব'লে থাকে যে ভয়ের উৎস হলো অজ্ঞতা। ফলে জ্ঞান দিয়ে তা অতিক্রম করা যায়। কথাটা আংশিক সত্য। অন্ধকারে যে ভূত থাকে না, একথা জানার বয়স যখন হয়, তখন আমরা সবাই অন্তত অন্ধকারের ব্যাপারে সাহসী হয়ে উঠি। একটা সাপের বিষদাঁত যে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে একথা জানতে পারলে আমরা সাপটাকে হয়তো ধরতে পারব (যদিও সবাই নয়)। **জ্ঞান** মানে **নিশ্চয়তা** (certainty)। নিশ্চিভাবে যদি জানা যায় যে কোনো কিছু আমার অস্তিত্বের, সুখের, বা ব্যক্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ নয়, তখন তাকে আমি আর ভয় পাব না। বেশ, ভালো কথা। কিন্তু তাহলে তো এটাও সত্য হয়ে যাচ্ছে যে **নিশ্চয়তাই ভয়ের উৎস:** আমি যদি নিশ্চতভাবে জানি যে একটা গ্লাসের পানিতে বিষ আছে এবং সেই বিষ আমার জন্য ক্ষতিকর, তাহলে তো সেই জ্ঞানই আমাকে ভয় দিয়ে আত্মরক্ষার পথ ক'রে দেবে। বৈদ্যুতিক তারে ভয়ংকর বিদ্যুৎ আছে একথা আমরা জানি ব'লেই আমরা তাকে ভয় পাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নিশ্চয়তা অনিশ্চয়তা উভয়ই ভয়ের কারণ হতে পারে এবং ফলে জ্ঞান ও অজ্ঞতা উভয়ই কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা থেকে আমাদেরকে বাঁচাতে পারে। একটা শিশু প্রথম বারের মতো একটা সাপ বা বৈদ্যুতিক তারকে ভয় পাবে না। কারণ সে সে-ব্যাপারে অজ্ঞ। এখানে তার সাহসের উৎস হলো অজ্ঞতা। মৃত্যু নিশ্চিত ব'লে আমরা তাকে ভয় পাই। তার আসার সময় অনিশ্চিত ব'লে তাকে ভয় পাওয়া উচিৎ আরো বেশি—কিন্তু এই অনিশ্চয়তার

www.pathagar.com

কারণে আমরা তাকে ভুলে থাকতেও পারি। পরকাল নিশ্চিত ব'লে আমাদের ভয়ে ভয়ে থাকা উচিৎ। কিন্তু যে বিশ্বাসী নয়, তার কাছে তা নিশ্চিতভাবে মিথ্যা। ফলে সে তাকে ভয় পায় না।

কোনোকিছু কিছু পরিমাণে ক্ষতির কারণ হতে পারে বা হবে এই ধারণা মনে পোষণ ক'রেও তার মোকাবেলা করা যায় *ঝুঁকি-গ্রহণের মনোভাব* নিয়ে। হিমালয়ের শৃঙ্গে ওঠা, বেকার অবস্থায় বিয়ে করা, ব্যবসায়ে লাভ হবে কিনা তা নিশ্চিতভাবে না জেনে (অধিকাংশ ব্যবসায়ে তা জানাও সম্ভব নয়) তাতে টাকা খাটানো—এসব ক্ষেত্রে ভয়কে ম্যানেজ করা হয় ঝুঁকি-গ্রহণের মনোভাব দ্বারা। তবে এসব ক্ষেত্রে ভয়ের মাত্রা সম্বন্ধে কিছু পূর্বধারণা (preconception) বা অনুমান (conjecture) বা বিশ্বাস (belief বা assumption) থাকে। ফলে এরূপ ভয়কে ম্যানেজ করারই দরকার হয় না, তা আগে থেকে ম্যানেজড, কারণ তা মাপা (measured)।

একটা দুর্বল কুকুরের পাশ দিয়ে একটা (দুর্বলের বিচারে) সবল কুকুর যেতে লাগলে দুর্বল কুকুরটা এমনিতেই ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠবে। মূলত এ কোনো অকারণ ঘেউ ঘেউ নয়—এর কারণ আছে। এক্ষেত্রে দুর্বল কুকুরটার আত্মবিশ্বাসের অভাব তাকে তার অস্তিত্বের ব্যাপারে ভীত ক'রে তুলেছে। এই ভয়কে **আত্মবিশ্বাস** (confidence) দ্বারা দূর করা যায়। কিন্তু কাকে বলে আত্মবিশ্বাস বা confidence? "আমি সবল" একথা কল্পনা করলেই আত্মবিশ্বাস গঠিত হয়ে যায় না। *আত্মবিশ্বাস হলো জ্ঞান, যোগ্যতা, অনুশীলন, অঙ্গীকার, মূল্যবোধ, এবং সর্বোপরি প্রেমপূর্ণ ত্যাগের মিলিত ফলশ্রুতি।* এ নিয়ে এখানে অল্প কথায় আলোচনা না করাই ভালো।

সুন্দরী নারীও ভয় পায়—পাছে সে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়, কিংবা তার স্বামী তার মধ্যে আর মধু না পেয়ে সংসারে অতৃপ্ত হয় কিংবা অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, অথবা অন্যান্য 'অসুন্দর' নারীর কাছে সে প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে এই ভয় উঠে এসে তাকে সর্বদা টেনশনে রাখে। ফলে সে নিজে তো হতাশায় ভোগেই, উপরন্তু গোপন ভয় দ্বারা তাড়িত হয়ে এমন ছোট-বড় বাড়াবাড়িও ক'রে ফেলে যা সংসারের সুখ নষ্ট করে আরো বেশি। এ দোষ পুরোপুরি তার নয়। তাকে এই হীনমন্যতা থেকে উদ্ধার করতে হবে প্রধানত তার স্বামীকেই। তাকে

www.pathagar.com

তার উচিৎ মূল্য দান করার মাধ্যমে তার আত্মবিশ্বাসকে রক্ষা করতে হবে। অবশ্য এই প্রসঙ্গেও এখন যাব না।

অধীন অফিসার যখন বস (Boss) অপেক্ষা দৃশ্যত বেশি যোগ্য এবং শিক্ষিত বা প্রশিক্ষিত হয়, তখন বসের আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়। এর ফলে সৃষ্ট হয় হীনমন্যতা (Inferiority Complex) এবং গুরুমন্যতা (Superiority Complex)। কেউ যখন নিজেকে ছোট মনে করে তখন সে ভেতরে হতাশায় ভুগলেও বাইরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে প্রাণপণে সচেষ্ট হয়। তখন সে গীবত বা পরনিন্দা, মিথ্যা গল্প, বাড়াবাড়িপূর্ণ অতীতচারিতা ইত্যাদির আশ্রয় নেয়। এরূপ ভয় এর কারণ বেশিদিন বহাল থাকলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সংকট (Indentity Crisis)) দেখা দেয়। এ থেকে মানসিক অবসাদ (stress), মিথ্যাচারিতা, হতাশাসহ বিভিন্ন ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এরূপ ব্যাধিরা মূল ঘাটি বাঁধে যে বোধটাকে ঘিরে তার নাম *আফসোস* (Discontent)। একটা মন যখন, উদাহরণস্বরূপ, তার কর্মস্থল থেকে এই ব্যাধি কুড়ায়, তখন সে ঘরে ফিরেও পরিবারের অন্যদের মধ্যে তা ছড়ায়।

বৃদ্ধ বয়সে সন্তানাদি হওয়ার পর যারা সচ্ছলতা হারায় বা পায় না, তাদের মনে এক বিরাট দুশ্চিন্তা কাজ করেঃ আমি ম'রে গেলে আমার সন্তানের কী হবে। বাবা মায়ের মন দয়ায় ভরপুর। **দয়ার সাথে যখন অনাস্থা ভয় হতাশা যুক্ত হয়, তখন তা বড় ব্যাধিতে পরিণত হয়**। একে বলে খাঁটি দুশ্চিন্তা রোগ (Anxiety)। এর উৎস ভয় হলেও এর আদি উৎস হলো অনাস্থা বা ভরসার অভাব। কিন্তু কিসের ওপর ভরসা? আল্লাহ্‌র ওপর।

অনেক লোককে দেখেছি যারা অভাব অনটনে প'ড়ে সংসারের মধ্যে দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট, মানবেতর জীবন-যাপন করে, কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে তাদের আত্মীয় সমাজ বা বন্ধু-সমাজ বেশ উঁচু মানের। তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। ফলে, 'ঠাঁট' বজায় রাখার জন্য তাদেরকে নিজের পরিবারের ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে মিথ্যে কথার ফানুস ওড়াতে হয়। অনেক সময়ে তারা আত্মসম্মান রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের সম্বন্ধে এক জনের কাছে এক গল্প ফাঁদে, অপরের কাছে ফাঁদে অন্য গল্প। এভাবে আশু আত্মসম্মান রক্ষা করার পর তাদেরকে দ্বিগুণ টেনশনে থাকতে হয় **মিথ্যা ব্যবস্থাপনা** নিয়ে চিন্তা করতে—কবে আবার ফাঁস

www.pathagar.com

হয়ে যায় আসল সত্যটা! গল্পপ্রবণ মহিলাদের এই সমস্যা বেশি হয়। এমন একজন লোক কোনো একটা বিষয়ে এক আত্মীয়ের কাছে গল্প দিচ্ছে, এমন সময়ে সেখানে এল তার এমন আর এক আত্মীয় যে তার উক্ত মিথ্যা গল্প শুনলে বুঝে ফেলবে যে তা মিথ্যা, কারণ যে সত্যটা জানে। তখন সে অকারণে—বাহ্যিক দৃষ্টিতে অকারণে, কিন্তু মূলত সত্য ফাঁস হবার ভয়ে ভীত হয়ে—অত্যন্ত দ্রুত তার আত্মীয়ের সাথে ঝগড়া বাধিয়ে বসল। এরকম উদাহরণ হয়তো অনেকেরই কম-বেশি জানা।

বিয়ের আগে মেয়ের বা ছেলের রূপের বা ব্যক্তিত্বের বা সম্পদের মূল্যকে বড় ক'রে দেখানোর জন্য এক পক্ষ অন্য পক্ষের কাছে অনেক মিথ্যে বলে। বিয়ের পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর 'ঝাল ওঠে'। সমাজের প্রথা এমন হয়ে গেছে যে যার বিশেষ কিছু মূল্য কম আছে, তার কপালে যেন আর বিয়েই জুটবে না—হোক সে ছেলে বা মেয়ে। এই দুর্বলতাকে না ঢাকলে সমাজে সম্ভ্রষ্ট নয়। সুতরাং অনেককে ভবিষ্যতের মধুর সম্পর্কের মধ্যে অনাকাঙ্খিত ফাটলের ঝুঁকি সৃষ্টি ক'রেও মিথ্যা দিয়ে সত্যকে আপাততভাবে ঢেকে রাখতে বাধ্য হতে হয়। এরূপ মিথ্যার ফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত সত্য গোপনকারীর মনে একটা ভয় থাকে, এবং সেই ভয়কে মনের গোপনে ম্যানেজ করতে গিয়ে যে টেনশনের সৃষ্টি হয় তা মাঝে-মধ্যে ব্যক্তিকে এমন আচরণ করতে বাধ্য করে যার পরিণাম হিসাবেই এক সময়ে সত্য বের হয়ে পড়ে। থলের বিড়াল বেড়িয়ে পড়লে আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন হয়। আর, একটা মানুষের যখন আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন হয়, তখন সে হয় আত্মহত্যা করে না হয় এমন সব আচরণ করতে শুরু করে যার প্রতিদানে তাকে অনেকেই সম্মান দিতে চায় না বা দেয়া আর সম্ভব হয় না।

এমন অনেক লোক দেখেছি যাদের মেধাগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেক হলেও তাদের সমমানের কোনো ডিগ্রী, পদ, বা ক্ষমতা নেই। ফলে তারা সর্বদা একটা হীনমন্যতায় ভোগে। তারা যখন জ্ঞানের আলোচনা করে তখন এমন চমৎকারিত্ব দেখাতে সক্ষম হয় যে শ্রোতা তখন উদগ্রীব হয়ে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে ফেলে। কিন্তু প্রশ্ন করার আগে সে এমন পূর্বধারণাও মনে পোষণ ক'রে ব'সে থাকে যে লোকটা হয়তো প্রতিষ্ঠানিক ভাবে উচ্চশিক্ষিত হবে। তার এই পূর্বধারণার কথা আচঁ

www.pathagar.com

করতে পেরে ডিগ্রীহীন জ্ঞানী ব্যক্তি তখন বিব্রতর পরিস্থিতিতে প'ড়ে যায়। সে তখন প্রশ্নের আগেই কেটে পড়তে চায়।

অনেক সময়ে ডিগ্রীধারী অহংকারী ব্যক্তি ডিগ্রীহীন জ্ঞানী ব্যক্তির যোগ্যতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে ইচ্ছেকৃতভাবে হেয় করার জন্য এরূপ প্রশ্ন করে বা নিজের জ্ঞানকে জাহির না করতে পেরে ডিগ্রীকে জাহির করে। এতে ক'রে অনেক বড় বড় ঝামেলার সৃষ্টি হয়।

আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙার আগে তাতে ভূতপূর্ব কমিউনিস্ট রাশিয়ার কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে প্রচলিত 'বিদ্যালয়মুক্ত শিক্ষা', ডিগ্রীবিহীন শিক্ষা, মুক্তচিন্তার চর্চ্চার নামে সাহিত্যচর্চ্চা ও কালচারচর্চ্চা করতে গিয়ে কিছু অত্যন্ত মেধাবী তরুণ-তরুণী এত বেশি সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ে যে তারা আক্ষরিক অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে বাদ দিয়ে শুধু তাদের বাম ভাবাদর্শের ধারক গুরু ঋষীদের তত্ত্বকথা নিয়ে চর্চ্চা করতে শুরু করে। এতে ক'রে সার্বিকভাবে না হলেও একটি বিশেষ দিকে তাদের অত্যন্ত ভালোভাবেই মেধাবিকাশ ঘটে বটে, তবে পরবর্তীতে পার্টি ভেঙে যাওয়ার পরে কিছু প্রচার মাধ্যম ও এন.জি.ও. ছাড়া অন্য কোথাও তাদের চাকরির সুযোগ হয়ে ওঠে না। ফলত তাদের অনেকেই এখনও কেবল তত্ত্বকথা মুখে আওড়াতে আওড়াতে অনাহারে থাকাটাকে রোযা রাখার চেয়ে বেশি. মহত্ত্বপূর্ণ ব'লে মনে করে। তারা অধিকাংশই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীদেরকে রীতিমতো হিংসা করে। তারা অন্যের উপস্থিতিতে নিজেদেরকে ছোট মনে করে ব'লে নিজেদেরকে অত্যন্ত বড় ক'রে দেখাতে চায়। তাদের অনেকে সুগঠিত জীবন-সংসারের স্বাদ না পেয়ে মুনি ঋষিদের মতো সেলিবেট (অবিবাহিত) এবং বৈরাগ্যপূর্ণ (তথা দারিদ্র্যপূর্ণ) জীবন যাপন করে। তাদের অনেকে সুন্দর সুন্দর কথা বলতে শিখেছেন বটে—কারণ জীবনের অনেক সমৃদ্ধি ত্যাগের বিনিময়ে চিন্তাশীল মানুষ আর কিছু না হোক জ্ঞান (ও স্বভাব ভালো হলে সম্মান) পেয়ে থাকেন—কিন্তু তাদের অধিকাংশের মনে থাকে অতৃপ্তিপূর্ণ আক্রোশ, যা তাদের চিন্তাভাবনাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। **বিপুল সৃজনশীলতা বা যৌক্তিক মেধা যখন 'অনিয়ন্ত্রিত বৈরাগ্যের' যাতাকলে পিষ্ট হয়, তখন তা বিপুল জ্ঞান সৃষ্টি করে, যা অনেকাংশে হয়ে যায় আবেগপ্রবণ এবং সাবজেকটিভ। এরূপ আবেগাপ্লুত মেধা যত মুক্তির গান গায়, তার পেছনে থাকে তার নিজস্বতার শেকলাবদ্ধ হবার ভয়, ফলে তাতে থাকে**

www.pathagar.com

কেবল সেই ব্যক্তির বা তার শ্রেণীর মুক্তির প্রতিশ্রুতি—তা সাবজেকটিভ মুক্তি, অবজেকটিভ বা নৈর্ব্যক্তিক নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুক্তির সংজ্ঞাই হলো সমস্ত সাবজেকটিভিটি বা এলোপাথাড়ি ব্যক্তিকেন্দ্রিক খেয়াল-খুশি থেকে মুক্তি, অর্থাৎ অনুভূতির অবজেকটিভ স্তরে পৌঁছানো। যে মুক্তি সাবজেকটিভ, তা কোনো মুক্তিই নয়, বরং তা হলো সাবজেকটিভিটির দৃঢ় বন্ধন। একেই বলে মায়া। এ থেকে শুধু উঠে আসে কষ্ট। এই কষ্টের মধ্যে যদি কেউ আনন্দ পায়, তাহলে সে আনন্দকে বলে ম্যাজাকিজম (mesochism) বা নিজেকে উৎপীড়ন করার আনন্দ—আত্মহত্যার আনন্দ—এক প্রকারের বিশালাকৃতির অভিমানঃ যে আত্ম আমাকে আনন্দ দিল না, তাকে আমি নিঃশেষ ক'রে দেব—এভাবে 'আত্ম' হেরে যায় অহংকারী, অভিমানী 'আমি'র কাছে। এই নারীসুলভ বিরহরোগে ভুগেছিলেন কীটস, মায়াকোভসকি, হেমিংওয়ে, প্রমুখ। তাদের অনিয়ন্ত্রিত বৈরাগ্য এবং আবেগপ্রবণতা তাদের জন্য আত্মহত্যা ডেকে এনেছিল। কীটস আত্মহত্যা করেননি বটে, তবে তিনি যা করেছিলেন তাকে বলা যায় ভ্রান্ত আত্মাহুতি—এক মহৎ বোধকে পূর্ণাঙ্গভাবে স্থূল দেহের কিনারায় এনে বলি দেয়া। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, উপায় ছিল ভ্রান্ত। কিন্তু যাকিছু ভ্রান্তি, তার নামে সাফাই গেয়ে কোনো লাভ নেই—পরিণামে তা ব্যর্থতাই ডেকে আনে। আল্লাহ বলেছেনঃ ওরা ভুলের মধ্যে আছে।

আমরা এতক্ষণ ভয় নিয়ে কিছু অগোছালো আলোচনা করলাম বিষয়টা জীবনের বিভিন্ন স্তরে কিভাবে বিভিন্নরূপে বিরাজ করে সে ব্যাপারে কিছু সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এতে ক'রে পরবর্তী আলোচনা বোঝা ও চালিয়ে যাওয়া আমাদের জন্য সহজ হবে। আমরা এখন প্রবেশ করব ভয়ের একেবারে গোড়ায়। তারপর জানব সব ধরনের ভয় থেকে কিভাবে মুক্তি পেতে হয়। আমরা তত্ত্বকথা এবং বিশ্লেষণকে খুব বেশি প্রধান্য না দিয়ে সেই কথাগুলোই বলব যা পড়তে পড়তেই মনের উন্নয়ন ঘটতে থাকে, এবং পরে কিছুটা অনুশীলন করলে যা ওষুধের মতো কাজ দেয়। ফলে আমাদের আলোচনা যতটা না পাবে দার্শনিক পূর্ণাঙ্গতা, তারও বেশি পাবে মনস্তাত্ত্বিক সজীবতা। এটা সেই যুগ যখন জীবনের জ্ঞানকে জীবনের কাজে লাগাতে হবে।

www.pathagar.com

ভয়ের জন্মবৃত্তান্ত

ভয় কি ?

কিভাবে তার সৃষ্টি হলো?

মনোবিজ্ঞান এর ব্যাখ্যা জানে না।

কিন্তু মন জানে।

মনোবিজ্ঞানের চেয়ে মন বড়।

মন প্রথম সত্য, মনোবিজ্ঞান হলো দ্বিতীয় সত্য।

কোনো বিষয়ে যার ভয় নেই, সেই ভয়ের রহস্য সে জানতে পারে না, অপরের ভয়ের সুযোগ নেয় মাত্র।

অপরপক্ষে, কোনো ক্ষেত্রে যে ভীত, সেও ভয়ের রহস্য জানতে পারে না, কারণ কোনো কিছুর রহস্য জানা যায় তা অতিক্রম করার পরেই, আগে নয়। রহস্যকে উদ্ঘাটন করা হয়ে গেলে তা আর রহস্য থাকে না, তা হয়ে যায় জ্ঞান। তখন তার প্রসঙ্গে 'জানা' শব্দটাকে ব্যবহার করা যায়, কারণ তাকে আর নতুন ক'রে জানার কিছু নেই।

ভয়ের রহস্য জানতে হলে আল্লাহ্‌কে ভয় পেতে হবে। কোনোকিছুকে ভয় না করা আল্লাহ্‌কে ভয় না করার সমতুল্য হবে কি না, কিংবা তাকে ভয় করলে আল্লাহ্‌র সাথে বেয়াদবি হবে কিনা—এই আতংকে থাকলে ভয়ের রহস্য যেমন জানা যাবে তেমনি ধীরে ধীরে সঠিক ভয়টা পাওয়া যাবে এবং অযৌক্তিক ভয় থেকে রেহাই পাওয়াও যাবে।

মৌলিক পর্যায়ে—একেবারে আদি পর্যায়ে—ভয় হলো প্রেমের ঠিক উল্টো পিঠ। প্রেমই ভয়ে রূপান্তরিত হয়।

অত্যন্ত সখের জিনিসটা বহু সাধনার পরে পাওয়া গেলে—অথাৎ জিনিসটা একবার হাতে এসে গেলে সেই শখই (প্রেমই) ভয়ে রূপান্তরিত হয়। তখন শখের উৎস (ব্যক্তির মন) এবং শখের বস্তু (যেমন এক খণ্ড হীরা, সুন্দরী স্ত্রী, নাদুস নদুস চাঁদের মতো সন্তান) একত্ব লাভ করে। তাদের মধ্যে মিলন ঘটে । প্রেম মানেই একত্ব। প্রেম হলো একটা মনস্তাত্ত্বিক শব্দ আর একত্ব হলো একটা বিশুদ্ধ যৌক্তিক-দার্শনিক শব্দ। এই একত্ব যদি বিভক্ত হওয়ার সম্ভাবনার হুমকির মুখে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তা তার কেন্দ্রিকতার (কেন্দ্রমুখী আকর্ষণ) ব্যাপারে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। কেন্দ্রকে এখানে একটা বৃত্তের কেন্দ্র হিসাবে কল্পনা করলে ভালো হবে। একটা কেন্দ্রিকতাকে অবলম্বন ক'রে একটা বৃত্তীয়তা (circularity) গ'ড়ে উঠলে যে পরিস্থিতির (বা বৈশিষ্ট্যাবলির যে সজ্জার) সৃষ্টি হয়, তাকে বলে একত্ব

www.pathagar.com

(একত্ব কোনো পরিমাপযোগ্য বিষয় নয়—এর পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো symmetry বা প্রতিসাম্য বা uniformity বা সুষমতা বা consistency বা সুসামঞ্জস্য)। অর্থাৎ প্রেমই একত্ব। একত্বই আকর্ষণ।

একত্বই অস্তিত্ব।

অস্তিত্বের প্রকাশিত রূপবিন্যাসই বাস্তবতা। বাস্তবতা মানেই স্বাভাবিক ঐক্য (unity), যা হলো ভারসাম্য (equilibrium)। এই ঐক্যের কেন্দ্রই (যেমন বৃত্তের কেন্দ্র) স্বাভাবিক সচেতনতা (consciousness)। এই সচেতনতা পরিধিসহ সমগ্র বৃত্তকে নির্দিষ্ট আকৃতি ও বিন্যাসে ধ'রে রেখেছে।

কিন্তু এই ঐক্য যদি সময়ের ব্যবধানে (যেমন ভবিষ্যতে কখনও) ঘটতে পারে এমন অনৈক্যের আশংকা করে তাহলে সেই সচেতনতা নিজেই নিজের প্রতি জাগ্রত (সচেতন) হয়ে ওঠে। একে বলে আত্মচেতনা। অন্য কথায়, চেতনা যখন নিজের একত্ব রক্ষা করার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে তখন তাতে আন্দোলনের বা গতির সৃষ্টি হয়। একেই বলে আত্মচেতনা। আরো সহজভাবে, চেতনা যখন নিজেই নিজের ওপর আপতিত হয়, তখন তাকে বলে আত্মচেতনা। ***আত্মচেতনার কম্পনকেই বলে ভয়।***

আত্ম (চতনা) কখন কম্পিত হয়? যখন তা তার ঐক্যের মধ্যে বিচ্যুতির পূর্বাভাস পায়। ফলে সে নিজেই নিজেকে নতুন ক'রে অনুভব করতে চায়। নিজেকে অনুভব করার এই প্রেমপূর্ণ প্রচেষ্টায় যে শক্তি বা এনার্জি ব্যয় হওয়ার কথা, তার ঘাটতি অনুভূত হওয়ার সাথে সাথে কাঁপুনির গতিশক্তি দ্বারা তা পূরণ হয়। এটাই ভয়।

একারণে সবচেয়ে শখের জিনিস পাবার আগ পর্যন্ত মানুষের মনে থাকে কামনা/আকাঙ্খা অর্থাৎ তীব্র প্রেমের টান/আকর্ষণ, যা ইচ্ছাশক্তি (willpower) আকারে প্রবাহিত হয়। মানুষ কী চায়? সে তাই চায় যা তার দারকার (ব'লে সে মনে করে) কিন্তু নেই—যা তার দরকারের ক্ষেত্রটা থেকে সময় বা স্থান বা অজ্ঞতার (যেমন ইঙ্গিত ও প্রশ্নের) দূরত্বে রয়ে গেছে। কামনার আকর্ষণী ক্ষমতা এই দূরত্বকে একটা মানসিক ঐক্যের বৃত্তের মধ্যে এনে দেয়। কিন্তু সে যেইমাত্র তা পায়, অমনি পূর্ববর্তী দূরত্বের স্মৃতির সচেতনতা তার

www.pathagar.com

আকর্ষণী ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে চায়, যেন তা আবার হারাতে না হয়। কিন্তু মহাবিশ্বে মোট এনার্জির পরিমাণ স্থির (থার্মোডাইনামিক্সের প্রথম সূত্র)। ফলে এই **কল্পিত** অতিরিক্ত শক্তির অভাবের অনুভূতি কাঁপুনি সৃষ্টি করে (অভাব আসলে ঘটেনি, চেতনার একটি বিশেষ স্তরে তার অভাব অনুভূত হয়েছে), যা থেকে সেই শক্তি উদ্ভূত হয়। কিন্তু মূলত ঐ শক্তিটুকু ঐ কাঁপুনি সৃষ্টি করার জন্যই প্রাথমিক বাস্তবতা থেকে ব্যবহৃত হয়েছিল। এভাবে ঐক্যের মধ্যেই একটা ক্ষণিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এটাই ভয় বা আশংকা বা আতংক।

আমরা এতক্ষণ যা বলেছি তা আমাদের মনে প্রথমত এমন একটা চিত্র ফুটিয়ে তোলে যা থেকে আমরা অনেকেই প্রথম দৃষ্টিতে হয়তো বলতে চাইব যে এ হলো **হারাবার ভয়।** সুতরাং সচেতন পাঠক হয়তো প্রশ্ন করবেন —পাবার ভয়টা তাহলে কেমন? পাবার ভয় ব'লেও তো একটা জিনিস আছে।

ঠিক। পাবার ভয় যা, হারাবার ভয়ও তাই। পাছে আবার হারিয়ে ফেলতে হয়, এই ভয়ে অনেকে কাঙ্খিত জিনিস পেতেও চায় না। এমন পুরুষকে হয়তো আমরা সবাই দেখেছি যারা অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে চায় না, পরে আবার হারাতে হয় কি না এই ভয়ে। সুতরাং উভয় প্রকার ভয়ের মূল মনস্তাত্ত্বিক ম্যাকানিজম আসলে একই। প্রথমটা হলো ঐক্যের বিভক্ত হয়ে যাবার ভয়, দ্বিতীয়টা হলো বিভক্ত হয়ে যেতে পারে এই আশংকায় ঐক্য সৃষ্টি করার ভয়। প্রথমটা হলো এনার্জির অভাব; দ্বিতীয়টা হলো ভবিষ্যৎ বিফলতাকে অনুমান ক'রে পর্যাপ্ত এনার্জি খরচ না করার প্রতিজ্ঞা।

একটা চমৎকার রহস্য সচরাচর আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। তা হলো এই যে, মনের গভীরে আমরা ভয়কে ভালোবাসি। আমরা ভয় পেতে ভালোবাসি! তাইতো শিশুর চিত্তবিনোদন ও মনোবিকাশের জন্য তাকে যেসব গল্প শোনানো হয়, এবং যেসব গল্প সে আগ্রহভরে শুনতে চায়, তাদের একটি প্রধান ধারার মূলে রয়েছে ভয়, আতংক, শিহরণ।

কেনই বা ভয় নিজেই একটি উপভোগের উৎস? ভয়ের আদিতম উৎস না জেনে এর ব্যাখ্যা জানা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

ভয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তখন যখন আদম-হাওয়া (আঃ) এর অন্তর আল্লাহ্‌র তাওহীদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রথম *বহির্মুখী* হলো। উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, এবং সেই বিচ্ছিন্নতার কথা কোনো কারণে বিস্মৃতির পর্দার নিচে চাপা পড়লে, মনের অচেতন স্তরে উৎসমুখী টান অনুভূত হয়, যা চেতনার স্তরে কাজ করে আত্মরক্ষার প্রবণতা আকারে। সার্বিক অখণ্ড চেতনার কোনো জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, শুরু নেই, শেষ নেই। তা অনন্ত। এর কারণে মানুষ তার *চেতনার স্তরে* অনন্ত। তার মন হলো দেহের ওপর আপতিত চেতনার প্রতিচ্ছবি। এ কারণে তার মন নিজের অজান্তেই খণ্ডত্বকে, ধ্বংসকে, মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চায়। অন্য কথায়, আমাদের আসল স্বভাব হলো অনন্তত্ব। এ কারণে আমাদের মন মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চায়। অর্থাৎ সেও তার আংশিকতাকে অস্বীকার ক'রে মূল আলোর অনন্তত্ব বজায় রাখতে চায়। কিন্তু দেহ-মনের অবস্থান পরিবর্তনশীল বাস্তবতার স্তরে। সেখানে অনন্তের অসীম বিস্তৃতি মনের দ্বারা জেনে নেয়া সম্ভব নয়। বরং তাতে বেশি প্রসারিত হয়ে পড়াকেই সে মৃত্যু ব'লে মনে করে। সীমায় যার অস্তিত্ব, অসীমই তার জন্য মৃত্যুস্বরূপ। অসীম যেহেতু সীমায় ছায়াপাত ক'রে মন সৃষ্টি করেছে, সেহেতু মনের বিচারে অসীম মানেই সীমার মধ্যে সীমাহীন কল্পনা; তার বিবেচনায় অস্তিত্ব মানেই তার সংকীর্নতাকে রক্ষা করা; তার বিবেচনায় অস্তিত্ব মানেই প্রকৃত অসীমের বিরোধিতা করা। আমাদের মন হলো একেকটি সীমিত বৃত্ত। অসীমকেও এমন একটি বৃত্ত আকারে কল্পনা করা যায় যার একটি কেন্দ্র আছে, কিন্তু কোনো পরিধি নেই। এই অসীমই যখন সীমা সৃষ্টির মাধ্যমে তার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব ফেলে, তখন সৃষ্ট হয় মানুষের মন বা নফস। ফলত মনের অবস্থা ও অবস্থান সীমিত হলেও তার নিজের কল্পিত কেন্দ্রকে ঘিরে তার যে চরিত্র গড়ে ওঠে, তার রীতি অনন্তেরই মতো। সে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে চায়। কিন্তু নিজের কেন্দ্রকে সে কখনও দেখেনি। ফলে তার অনন্তের বাসনার পক্ষে কোনো স্থায়ী সমর্থন নেই। ফলে দেখা যাচ্ছে যে মনের বাসনা রয়েছে অনন্তসুলভ, অথচ তার অস্তিত্বের ব্যাপারে তার নিজেরই নেই কোনো নিশ্চয়তা। এ কারণে সে ভীত। একটু চিন্তা করলেই লক্ষ্য করা যাবে যে *মন তখনই মৃত্যুভয়ে কাঁপে যখন সে কামনাপূর্ণ হয়। কামনাহীন মন মৃত্যুকে ভয় পায় না*। শুধু তাই নয়, এমনও মন আছে যা মৃত্যুকে এক গ্লাস শরবতের মতো মনে করে।

www.pathagar.com

এ কারণে আল্লাহ্ কোরআনে চমৎকারভাবে বলেছেন—প্রতিটি জীবনসত্তাকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ এই মৃত্যু কারো জন্য কঠিন যন্ত্রণা (যা আয়াতটির বাণীভঙ্গি থেকে টের পাওয়া যাচ্ছে), এবং তা কারো জন্য আসলেই সুস্বাদু।

অনন্ত ঐক্য থেকে স্খলনের অনিবার্য পরিণতি হলো অনন্তের অনুপস্থিতির অনুভূতি। অর্থাৎ চেতনার বর্তমান স্তরের অপূর্ণাঙ্গতার অনুভূতি। একেই বলে ভয়। এখান থেকেই সকল ভয়ের শুরু।

এই ঐক্যের দিকে ফিরে যাওয়ার একমাত্র উপায় হলো এই ভয়কেই ব্যবহার করা। ভয়কে গ্রহণ করতে হবে। খুশি মনে আল্লাহ্কে ভয় পেতে হবে। তাহলে ভয়ের কম্পন থেকে সৃষ্ট শক্তির সাহায্যে ত্যাগ করা যাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাগতিক মায়া, এবং এভাবে ছায়ার প্রতি আকর্ষণ কমতে থাকবে।

মনের যে স্তরটি সৃজনশীল, তা পবিত্র ও সৎ। তা কলুষিত হয় কেবল তার অপব্যবহারের কারণে। এই স্তরে মন নিজেই বদ্ধমূল ধারণা থেকে বের হয়ে এসে সত্যকে আবিষ্কার করার জন্য নতুন নতুন সম্ভাবনাকে যাচাই করে। এই স্তরে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সে কখনও এডভেঞ্চার কখনও থ্রিলকে আহবান করে। এ হলো মনের এক জাতীয় কোরবানির স্পৃহা। এডভেঞ্চারের মাধ্যমে সততা বজায় রেখে সত্যকে উদ্ঘাটন করার বা রক্ষা করার কল্পনা করতে হলে মনকে অনেক সুখের স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়ে অনেক ঝুঁকিও গ্রহণ করতে হয়। রোমহর্ষক কাহিনীর মধ্য দিয়ে নিজেকে শিহরণ ও ত্রাসের কন্টকময় পথের ওপর দিয়ে চলতে চলতে তাকে অনেক সুখস্বপ্ন এবং সহজ ভাবকে কোরবানি করতে হয়। তবুও সে তাতে আনন্দ পায়। কারণ, সে নিজের অজান্তেই জানে যে সে অস্থায়ী এবং অসম্পূর্ণ, এবং তাকে এই অসম্পূর্ণতাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে, খণ্ডত্বকে ত্যাগ করতে হবে। স্থায়িত্বের বাসনা এভাবে তাকে নিজেকে পরীক্ষার সম্মুখীন করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ থেকেও বুঝা যায় যে ভয়কে সাদরে গ্রহণ করা না হলে অনন্তের দিকে অগ্রসর হওয়াই সম্ভব নয়।

ভয়ের এক বিরাট অংশই জেনেটিক। যারা জন্ম থেকেই ভীরু এবং সৎ, তারা আল্লাহ্র রহমত প্রাপ্ত। কারণ তাদের ভয় তাদেরকে পাপ কাজ থেকে দূরে রাখে। যারা জন্ম

www.pathagar.com

থেকেই সাহসী এবং সৎ, তাদের সংখ্যা নগণ্য। এদের মধ্যে যারা সৎসাহসী থাকতে পারেন, তাদের সংখ্যা আরো কম। কারণ তীব্র সাহস সততার মাত্রায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে অনেক সময়ে সফলতার দ্বারা আটকে গিয়ে অসৎ হয়ে যায়। যারা মু'মিন স্তরে পৌঁছে যান, তারা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করেন না। ভয়কে সঠিক উপায়ে ম্যানেজ করতে পারলে তা থেকে প্রচুর জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও পবিত্রতা লাভ হয়। আল্লাহ্কে ভয় পাবার অভাবে আমি অন্য কিছুকে—যেমন ব্যক্তিকে, অন্যায়কে, অভাবকে বেশি ভয় পাচ্ছি কিনা, এই আতংক সর্বদা মনে জাগিয়ে তুলতে পারলে তীলে তীলে ভয় চ'লে যায় এবং তার বিনিময়ে অর্জিত হয় ধৈর্য, সাহস, জ্ঞান, এবং মানসিক স্থিরতা। এ ব্যাপারে এস. এম. জাকির হুসাইনের *ধ্যানের শক্তি ও নবজীবন* বইটি সহায়ক হতে পারে। ভয়কে ম্যানেজ করতে না পারলে বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ এ থেকেই সৃষ্ট হয় লোভ (নিস্বতার ভয়), হতাশা (বিফল হবার ভয়), ক্রোধ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা তথা সমস্ত খারাপ আবেগগুলি। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, আল্লাহ্কে ভয় না পেয়ে অন্য কোনো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভয়কে ম্যানেজ করলে তার সুফলের চেয়ে কুফলই বৃদ্ধি পাবে।

কারণ, ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ে মানুষ তার উৎস থেকে তাঁরই দিকে ফিরে যাবার জন্য যে উপায়টিকে সাথে এনেছে, এবং যা তাকে ফিরে যাবার আগ পর্যন্ত আত্মরক্ষায় সাহায্য করবে, তা হলো ভয়। সৎ হৃদয় ভয় পেয়ে আনন্দ পায়, অসৎ হৃদয় আনন্দ পায় অন্যকে ভয় দিয়ে। অবশ্য গুরু চাইলে ভয়কে শিস্যের মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। আল্লাহ্র ভয় ছড়িয়ে দেয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচার। ■

পুস্তিকাটি প'ড়ে বুড্ডা বলল—'কিন্তু অনেক সময়ে মন যে ভয়ই পায় না। সে বলে—আল্লাহ্ দয়াময়; তিনি ক্ষমা করবেন। —এখন কী করি?'

প্রফেসর বললেন—'আগামীকাল একটা ক্লাবে আমি একটা সেমিনারের আয়োজন করেছি। শিরোনাম *'আল্লাহ্র দয়া থেকে সাবধান!'* তোমার বেয়াড়া অন্তরটাকে ভয়ে টুকরো টুকরো ক'রে দেয়ার জন্য এই সেমিনারটাই যথেষ্ট। তুমি থাকবে ওখানে।'

www.pathagar.com

নয়. বদ্ধ ঘরে বাইরের বাতাস

গুরু চ'লে গেলে বুড্ডা জানালার পাশে চুপচাপ ব'সে রইল। এ জীবনটা তার ভালো লাগছে না। যাঁর জীবন তাঁকে দিতে পারলাম না। তাহলে তাকে আটকাচ্ছে কে? মৃত্যু এসে জীবনটাকে ছিনিয়ে নেয়ার আগে তাকে উৎসের কাছে ফিরিয়ে দেয়া কি তাহলে আদৌ সম্ভব হবে না? তা যদি না হয়, তাহলে দ্রুত শেষ হয়ে যাক এই জীবন। এ আমি চাই না। সে ভাবল।

একটু পরে কলিং বেলে চাপ পড়ল। এবং একটি মেয়েলি কণ্ঠ—'দরোজাটা খুলতে হবে।' চেনা কণ্ঠ।

বুড্ডা যেমন ব'সে ছিল তেমনি ব'সে রইল। কারণ দরোজা খোলাই আছে। গুরু চ'লে যাবার পর সে ছিটকিনি লাগায়নি।

'দরোজাটা খুলতে হবে।'

বুড্ডা জবাব দিল—'খোলাই আছে।'

দরোজা খুলে গেল।

ঘরের মধ্যে বাইরের বাতাস ঢুকলো।

এবং এক ধাবকা ঘ্রাণ।

বুড্ডা উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ছায়ার দিকে তাকাল না। তাকে বলা হলো—'আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

বুড্ডার কাছে এই মুহূর্তে কোনো গার্হস্থ্য কণ্ঠ ভালো লাগছে না। তার লক্ষ্য এখন অন্যদিকে। এমন অবস্থায় পার্থিব কোমলতাকে বিরক্তিকর ব'লে মনে হয়। সে বলল—'আমি বহু আগে পৃথিবীর সব মানব জ্বিন জীবজন্তুকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছি।'

'কিন্তু আমি তো বিশেষ ক্ষমা চাই। সাধারণ ক্ষমা চাই না। বেনামী ক্ষমা দিয়ে আমার কী লাভ। আপনি তো নাম ধরে ক্ষমা করেননি।'

বুড্ডা ভাবল—ক্ষমাপ্রার্থনার মধ্যেও শর্ত! ক্ষমাপ্রার্থনার মধ্যেও অহংকার! তাহলে কি এভাবেই অসংখ্য মানুষ আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চায়? তাহলে কি এ কারণেই এতকাল ধ'রে যা চাচ্ছি তা পাচ্ছি না? সে বলল—'নামটা জানতে পারলে তো নাম ধ'রে একবার ক্ষমা ক'রে দায়মুক্ত হতে পারতাম।'

www.pathagar.com

'থাক, হয়েছে। ওরকম দায়-সারা ক্ষমার দরকার নেই আমার।'

এবার বুড্ডার মনে অপরাধবোধ জাগল। সে ভাবল—ক্ষমা না করতে পারা এক জাতীয় অক্ষমতা এবং অহংকার। দুটোই বন্দিত্বের কারণ। তাই সে বলল—'আসলে আমি ক্ষমা ক'রে ধন্য হতে চাই।'

কোমল কণ্ঠে ললিত উচ্চারণ শোনা গেল—'আমার নাম ছায়া।'

একটু নীরব থেকে বুড্ডা বলল—'কার?'

ছায়া চমকে উঠল। প্রশ্নটি তৎক্ষণাৎ তার মনে নতুন ক'রে প্রতিধ্বনিত হলো—আসলে আমি *কার* ছায়া? তার সারা শরীর শিহরিত হলো। নিজেকে সে জীবনে এই প্রথম কোনো প্রশ্নের মধ্যে খুঁজে পেল। তাই জবাব খোঁজার কোনো পথই সে খুঁজে পাচ্ছিল না। কিন্তু তার তৎক্ষণিক আবেগ এবং পূর্বপ্রস্তুতি তার মনে হঠাৎ ক'রে একটি জবাব সৃষ্টি করল। সে তা চেপে রাখার কথা ভাবছে এমন সময়ে তা মুখ থেকে বের হয়ে এল—'যার কাছে দাঁড়িয়ে আছি।' কথাটি বলার সাথে সাথে একটি হীনমন্যতাবোধ ছায়াকে আচ্ছন্ন করল। সে ভাবল—এত সহজে এভাবে ধরা দেয়া তার আদৌ উচিৎ হয়নি। সে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটি করেছে।

ছায়ার জবাব শুনে বুড্ডার বুকে শেল বিঁধল। কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তার ভেতর থেকে অস্বীকৃতি এবং আত্মরক্ষামূলক প্রতিবাদ উঠে এল, যেমনটি হয় সচরাচর মেয়েদের ক্ষেত্রে। সে বলল—'আমি সূর্যমুখী হয়ে পথ চলি। ছায়ার সাথে আমার কমই দেখা হয়। প্রায়ই সে আমার পিছনে থাকে।' কথাগুলি বলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। হার্টবিট বেড়ে গিয়েছিল।

এই জবাব শুনে ছায়া আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে গেল। সে বুড্ডার জন্য খাবার এনেছিল। তা তার হাত থেকে প'ড়ে গেল। বুড্ডা টেবিলের ওপর মুখ ঢেকে বসে পড়ল। ছায়া ঝড়ের বেগে সশব্দে দরোজাটা বন্ধ করে দিয়ে বের হয়ে গেল।

বুড্ডা বুঝতে পারল সে অহংকার ক'রে ফেলেছে। কিন্তু সে নিরুপায়। আত্মরক্ষা করার অন্য কোনো উপায় তার মাথায় আসেনি। আত্মরক্ষার জন্য একটি পূর্বপরিকল্পনা না থাকলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘ'টে যায়। এবং তখন বুদ্ধির চেয়ে তাতে আবেগের ভূমিকাই প্রধান হয়ে ওঠে। তবুও সে লজ্জিত হলো। সে ভাবল—তবুও ভালোই হলো। ব্যাপারটার এখানেই ইতি ঘটুক।

সে উঠে গিয়ে গোস্ত-রুটি বিছানো কার্পেটটি সাফ ক'রে ফেলল। তারপর কৃতজ্ঞতার সাথে যেটুকু খাবার ছিল তা খেয়ে নিল। এখন তার একটি লম্বা ঘুম দরকার।

www.pathagar.com

দশ. আম যার ঝুড়িও তার

রাতে গুরু এলেন না। বুড্ডার জন্য খাবার পাঠিয়ে দিলেন। সে রাতে না ঘুমিয়ে গুরুর দেয়া ধ্যানের স্ক্রিপটিকে বারবার পড়তে লাগল। শেষ রাতের দিকে সে বিছানায় ব'সে থাকা অবস্থায় তন্দ্রাবিষ্ট হয়ে পড়ল। সে স্বপ্ন দেখল। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একটি উদ্যানে হাঁটছে। তার মাথায় একটি সুন্দর ঝুড়ি। সে জানে না কোথায় তা পেয়েছে, কেনই বা তা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, আর যাচ্ছেই বা কোথায়। সে ঝুড়িটি মাথায় নিয়ে হাঁটছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তার এই নিরুদ্দেশ হেঁটে যাওয়াতে সে অবাক হচ্ছে না। কিন্তু সে একটি বিষয় লক্ষ্য ক'রে অবাক হলো। সে ঝুড়ি মাথায় হাঁটছে, এবং আশে-পাশের পথ দিয়ে চলতে-থাকা অনেক লোক দৌড়ে এসে তার ঝুড়িতে একটি ক'রে আম দিয়ে যাচ্ছে। কেউ তার সাথে কথা বলছে না। সেও কারো সাথে কথা বলছে না। মুহূর্তের মধ্যে তার ঝুড়িটি ভ'রে গেল। সে আর হাঁটতে পারছে না। সে যখন একেবারে ক্লান্ত, তখন সে এ ব্যাপারে ভাবতে শুরু করল। সে বুদ্ধি ক'রে একটি নিভৃত স্থানে গিয়ে আমগুলি ফেলে দিল। তারপর আগের মতো ঝুড়ি-মাথায় হাঁটতে লাগল। কিন্তু আগের মতো এবারও একই ঘটনা ঘটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ঝুড়িটি পূর্ণ হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল যে সে সমস্যায় পড়েছে। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নের সমস্যার কারণ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। তাছাড়া মাথায় ভরা ঝুড়ি থাকলে তখন বুদ্ধি বেশি কাজ করে না।

এমন সময়ে গুরু এলেন। বুড্ডা তার দিকে অসহায়ের মতো ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল।

বুড্ডা বলল—'স্যার, বারবার ভ'রে যাচ্ছে।'

'খালি থাকলে তো ভরবেই।'

'তাহলে?'

'ঝুড়িটা সব সময়ে ভ'রে রেখো। তাহলে আর তা বারবার ভরবে না।'

বুড্ডার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। সে যে গুরুর কথা মেনে নিতে পারেনি তা তার মুখ থেকে বুঝা যাচ্ছিল। তখন গুরু বললেন—'ঝুড়িটা খালি ক'রে ফেল।'

www.pathagar.com

বুড্ডা খুশি-মনে আমগুলো ঢেলে ফেলে দিল। তারপর ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। পেছন থেকে গুরু তাকে ডেকে ফিরালেন। বুড্ডা ঝুড়ি-মাথায় ফিরে এসে গুরুর সামনে রোবটের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

গুরু তাকে সবগুলো আম ঝুড়িতে ওঠাতে বললেন।

তারপর ঝুড়িটিকে আবার মাথায় নিতে বললেন।

'এবার ঝুড়িটাকেই নিচে নামিয়ে রাখ।'

বুড্ডা ফাঁকা কলসির মতো হেসে উঠল। সে নিরুদ্বেগ হাঁটতে হাঁটতে মন্তব্য করল—'আমও গেল, ঝুড়িও গেল।'

'একেই বলে মুক্তি,' পেছন থেকে বললেন গুরুজী।

বুড্ডা ময়লা ঝাড়ার মতো হাত-দুটি ঝাড়তে ঝাড়তে চ'লে গেল।

www.pathagar.com

এগার. দয়ার ধ্বংসাত্মক শক্তি

পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় সেমিনার। বুড্ডা সেখানে গিয়ে দেখে অডিটরিয়াম ফাঁকা। কেউ আসেনি।

'আগে থেকে কোনো প্রচার করেননি, স্যার?'

'প্রচার করেছিলাম ব'লেই কেউ আসেনি। সবাই আল্লাহ্‌র দয়ার দোহাই দিয়ে পার পেতে চায়। কেউ দয়াময়কে, দয়াময়ের দয়াকে ভয় পেতে চায় না। দয়াময় নিজেই বলেছেন যে দয়াময়কে ভয় করার কথা বললে মানুষের অহংকার ক্ষেপে ওঠে, এবং সে জেদবশত জোরে-সোরে পাপে লিপ্ত হয়, একেবারে জেদী শিশুর মতো:

> আর যখন তাকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর,' তখন তার অহংকার তাকে পাপকাজে লিপ্ত করে। তাই তার উপযুক্ত স্থান জাহান্নাম; আর সে তো খুব খারাপ জায়গা।
>
> (সূরাঃ বাকারা, ২০৬)

এই বিদ্রোহ স্বাভাবিক। মানুষ ভাবে—দয়াময়ই যখন হলে প্রভু, তখন পাপ করতে না বলে, আহ্লাদ না দিয়ে, ভয় করতে কেন বলছ? সবাই **দয়াময়ের দয়ার ভাগী হতে চায়, নিজে দয়া করতে চায় না।** যাহোক, আপাতত তুমিই অডিয়েন্‌স্। সুতরাং প্রবন্ধ পাঠ শুরু হলো:

আল্লাহ্‌র দয়া থেকে সাবধান!

Love Theory of Punishment

অনেক শ্রোতা হয়তো ভাবছেন—গোমরাহি করি, পাপ করি, গাফিলতি করি, অনেক সময়ে যে সব ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম সেসব ক্ষেত্রেও আল্লাহর দয়ার ওপর বিশ্বাস রেখে পাপ ক'রে যাই—এবং সবকিছুর পর, মনের পাপের তৃপ্তি মিটে গেলে, কিংবা মৃত্যুর সময় হলে, পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করি, ক্ষমা চাই; আজীবনের ভুল-

www.pathagar.com

ভ্রান্তির পর একটাই ভরসা—আল্লাহ্‌র দয়া। অথচ এই লোকটা বলে কি না আল্লাহ্‌র দয়া থেকে সাবধান! লোকটার মাথা খারাপ হয়নি তো!

প্রিয় বন্ধু আপনি যে প্রথমতঃ আমার প্রস্তাবে অবাক হতে পেরেছেন এটাই আমার বড় পাওনা। মানুষ কখন অবাক হয়? যখন কোনো কিছু সম্বন্ধে তার যে ধারণা ছিল তা বৈপ্লবিক কায়দায় ভেঙ্গে যায়। তাহলে একই বিষয় নিয়ে আরো কয়েকবার মারাত্মকভাবে অবাক হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন। মৃত্যুর সময়ে কিন্তু মানুষ প্রথমতঃ যা হয় তা হলো অবাক—প্রচণ্ড পরিমাণে অবাক হয়, যার কারণে সে চোখ বড় বড় ক'রে তাকিয়ে তাই দেখতে থাকে যা সে এতকাল অজ্ঞতার বা জ্ঞানের অন্ধত্বের কারণে অস্বীকার ক'রে এসেছিল:

মৃত্যুর আগে: তাদের হৃদয়ে সন্দেহ আছে, তাই তারা সন্দেহের দোলায় দোলায়িত। (সূরা তওবা, ৪৫)

মৃত্যুর সময়েঃ —এখন তোমাদের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে নিয়েছি, আজ তোমরা **স্পষ্ট দেখছ।** (সূরা ক্বাফ, ২২)

সুতরাং এই প্রবন্ধপাঠ শুনে যদি কেউ প্রচণ্ড পরিমাণে অবাক হতে পারেন, তাহলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ ***দয়াময়*** তাকে রহমত করবেন।

প্রিয় বন্ধু! পাপ ক'রে কার কাছে ক্ষমা চাই আমরা? দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে। তিনি নিজেই তাঁর দয়াময় নামের দোহাই দিয়ে ক্ষমার প্রতিজ্ঞা করেছেন:

যে ব্যক্তি তওবা করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে সে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়, [ফলত আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন]।
(সূরা ফোরকান, ৭১)

তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাদের জন্য কল্যাণ হবে।
(সূরা তওবা, ৭৪)

তোমাদের প্রতিপালক দয়া করাকে তাঁর কর্তব্য ব'লে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতাবশত যদি খারাপ কাজ করে অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধন করে, তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আন'আম, ৫৪)

www.pathagar.com

কিন্তু এখন ভাবুন তো: আমরা পাপ করি, এবং করতে পারি, কোন কারণে? জবাব ঐ একই—দয়াময় আল্লাহ্‌র অসীম দয়া ও ধৈর্যের কারণে। পাপ করার সময়ে তিনি যদি আমাদেরকে ধ্বংস ক'রে দিতেন, তাহলে তখন আর তাঁকে দয়াময় ব'লে প্রশংসা করতাম না। কতবার যে পাপ করি আর কতবার যে তওবা করি, তা অন্ততঃ কেউ না হোক নিজে জানি। নিজের অফিসের ক্যাশিয়ারটা যদি অতবার পাপ করত (টাকা লুটত) আর ক্ষমা চাইত, তাহলে কি আমি তাকে ক্ষমা করতাম? না। ক্ষমা যে আমার দ্বারা করা সম্ভব নয় তা আমি আগেভাগে জানি ব'লে সবকিছু এমনভাবে কন্ট্রোল করি যেন সে সহজে কোনো ঘাপলা সৃষ্টি না করতে পারে। অর্থাৎ তাকে পাপ করার সুযোগটাই দেই না। তাতে তারও মঙ্গল আমারও মঙ্গল। বাড়ির কাজের মেয়েটা চুরি ক'রে চিনি খায় যদি—এই ভয়ে আমার গিন্নি চিনির বয়েমটাকে অনেক উঁচুতে উঠিয়ে রাখেন। গিন্নির অবশ্য বুদ্ধিটা আমার চেয়েও বেশি পাকা এবং ছিপছিপে। তাই তিনি বয়েমটাকে এমন এক কুতুবমিনারের চূড়ায় উঠিয়ে রাখেন যেখান থেকে তা পাড়তে গেলেও প'ড়ে কাজের মেয়েটার ঠ্যাং ভাংবে। কত পরোপকারী এবং হিসেবী তিনি—তিনি নিরীহ মেয়েটাকে পাপ করারও সুযোগ দিলেন না। তাতে তো মেয়েটারই মঙ্গল। পাপ না থাকলে তো প্রায়শ্চিত্তও হবে না।

হে বন্ধু! ***আল্লাহ্ আমাদেরকে পাপ করার পূর্ণাঙ্গ সুযোগ দিয়েছেন। সেই সুযোগ পেতে পারছি ব'লেই তাঁকে আমরা দয়াময় বলছি। নইলে বলতাম না।*** অর্থাৎ তাঁর দয়ার সুযোগ নিয়েই আমরা পাপ করছি। আল্লাহ্ নিজেও কোরআনে একথা বলেছেন যে, তিনি তাঁর দয়ার গুণের দ্বারাই আমাদেরকে পাপের সুযোগ দান করেন:

অতঃপর ওরা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল, আল্লাহ্ ওদের হৃদয় বাঁকা ক'রে দিলেন। [তিনি বাধা দিলেন না, কারণ তিনি দয়াময়]। (সূরাঃ সাফ, ৫)

যার হৃদয়কে আমি (আমার করুণা দ্বারা) আমাকে অবহেলা করার অনুমতি দিয়েছি, সে অধীনতা স্বীকার করবে না (এবং বিভ্রান্ত হতেই থাকবে)। (সূরাঃ কাহাফ, ২৮)

www.pathagar.com

তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমি তাদের জন্য (রহমতের) সমস্ত কিছুর দরজা খুলে দিলাম; অবশেষে তারা যখন তাদের যা দেয়া হয়েছিল তাতে মত্ত হলো তখন অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম (দুঃখ কষ্টে ফেললাম), ফলে তখন তারা নিরাশ হলো।

(সূরাঃ আন'আম, ৪৪)

কেউ যা ভালো তা ত্যাগ করলে (আমি) তার জন্য কঠোর পরিণামের পথ **সহজ ক'রে দেব** [ফলে আমার দয়া ও স্বাধীনতা প্রদানের কারণেই তার ধ্বংস সহজ ও ত্বরান্বিত হবে]। (সূরাঃ লাইল, ৮-১০)

এখন ভাবুন তো: বেশ তো আনন্দ ফুর্তি ক'রে পাপ করছি, পাপ করতে পারলেই খুশি হচ্ছি, তাঁর দয়ার ওপর দিনদিন বিশ্বাস বাড়তেই থাকছে—এসব আসলে কী? এসব আসলে আল্লাহ্‌র দয়ার ধ্বংসকারী দিক। কত গর্দভ এই দুপেয়ে মানব সন্তান যে, সে আল্লাহ্‌র দয়ার বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস করে অথচ তাঁর এক নাম বা বৈশিষ্ট্য যে কাহ্‌হার বা কঠোর সে কথা ভুলে যায়। শুধু তাই নয়, সে কথা বিশ্বাস করতে হলে তার নফ্‌স এমন তর্ক শুরু ক'রে দেয় যে তখন তার বিশ্বাসটুকু কর্পূরের মতো হাওয়ায় উবে যায়। তখন তার নফ্‌সের আলাপ শুনলে আর বুঝতে বাকি থাকে না যে সে মনে করে যে তর্কশাস্ত্রে সে-ই পৃথিবীর সবচেয়ে পারদর্শী ব্যক্তি।

আমাদেরকে অত্যন্ত সাবধানে মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ্‌ নিজেই বলেছেন যে, তিনি মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেন তাঁর দয়া ও ধৈর্যের বৈশিষ্ট্য দ্বারা। নিচের আয়াতগুলো বিবেচনা করুন:

বল, যারা বিভ্রান্তিতে আছে **দয়াময়** তাদেরকে প্রচুর **অবকাশ/ ছুটি/ সুযোগ দেবেন** (পাপ করার), যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তা দেখবে — তা শাস্তি হোক অথবা কেয়ামত হোক। (সূরাঃ মরিয়ম, ৭৪)

নিজের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেও এই সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। তখন আর এই 'ব্যতিক্রমধর্মী'

www.pathagar.com

সত্যকে ব্যতিক্রমধর্মী ব'লে মনে হয় না। যেমন—এবং সত্য সত্যই এটা ঘটে থাকে—একটু হিসেবী মায়েরা উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেটার বাবাকে বলে—"আহলাদ দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে ধ্বংস করেছ; এখন তুমিই সামলাও।" আহলাদ মানেই তো দয়া, নয় কি? **একটা সীমার পরে** তাই-ই কি ছেলেকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট নয়?

আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না যে আল্লাহ্ আমাদেরকে ধ্বংস করেন তাঁর দয়া দ্বারাই, এবং ঠিক একইভাবে, একটা সীমার পরেই:

হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে সব ভালো বস্তু বৈধ করেছেন সেগুলোকে তোমরা অবৈধ কর না এবং সীমা লঙ্ঘন ক'রো না [তা করলে ভালো বস্তুই তোমাদের ধ্বংসের কারণ হবে, কারণ]; আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা মায়িদা, ৮৭)

আল্লাহ্ পাপও ক্ষমা করেন—যদি তা সীমার মধ্যে থাকে, অথচ তিনি ভালো ভোগ লালসাকেও ক্ষমা করেন না - যদি তা সীমা লঙ্ঘন করে। সীমার ব্যাপারটা আল্লাহ্র কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি পবিত্র কোরআনে 'সীমা' শব্দটিকে উচ্চারণ করেছেন শত শত বার (এই মুহূর্তে আমার কাছে সঠিক তথ্যটি নেই)।

আল্লাহ্ ইহুদীদের ওপর সেই চার হাজার বছর আগে থেকে প্রচণ্ডভাবে দয়া করেছেন। তারা তখন ছিল মহাবিশ্বের মানবমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ- দেহের গড়নে, মেধার যোগ্যতায়, আয়ুষ্কালে—সবক্ষেত্রে। পৃথিবীর ইতিহাস একথা বলে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মেধার এক বিরাট অংশই এসেছে মানবজাতির এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী অর্থাৎ ইহুদী গোষ্ঠী থেকে। কোরআনও ঠিক একই তথ্য দেয়:

হে ইসরায়েল বংশধরগণ (ইহুদীগণ), আমার সেই **দয়ার** কথা স্মরণ কর যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং সারা বিশ্বের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

(সূরাঃ বাকারাহ, ৪৭)

www.pathagar.com

আমি তো বণি-ইসরায়েলকে গ্রন্থ, কর্তৃত্ব (নেতৃত্ব ও ক্ষমতা) ও নবুওত দান করেছিলাম - - - এবং তাদেরকে বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (সূরাঃ জাষীয়া, ১৬)

এখন তাহলে প্রশ্ন হলো—কিসের কারণে তারা এত বড় হতে পারল? নির্দ্বিধায় সবাই বলবে—আল্লাহ্‌র দয়ার কারণে। আল্লাহ্‌র দয়াই অস্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন ডাইমেনশনে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা ও নে'য়ামতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু তারা বিভ্রান্ত হলো কেন? এবারও জবাব অভিন্ন—আল্লাহ্‌র দয়ার কারণে। আল্লাহ্ তাদেরকে যা দিয়েছেন, তাই-ই তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। গোটা মানব জাতির ক্ষেত্রেই একই ঘটনা সত্য। তার ওপর তারা পেয়েছে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে কিছুকালের ছুটি বা অবকাশ। দয়ার ওপর আরো দয়া। ফলে তাদের আর ধ্বংস হবে না—তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত!

সুতরাং ওদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে মুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো **ওসবের দ্বারাই** ওদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান এবং ওরা অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় ওদের আত্মা দেহত্যাগ করবে। (সূরাঃ তওবা, ৮৫)

আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার দয়া—তা তো প্রত্যেক বস্তুতেই প্রাপ্ত। [অর্থাৎ তাঁর দয়াই কর্মফলের কারণে শাস্তিতে রূপান্তরিত হয়।] (সূরাঃ আ'রাফ, ১৫৬)

কারণ আল্লাহ্ বলছেন—"তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই।" (সূরা ইয়াসিন, ১৯)

যাহোক, এখন আসল রহস্যে প্রবেশ করি। এখনই শুরু হবে প্রকৃতার্থে অবাক হবার পালা। অর্থাৎ খাঁটি এবং মৌলিক সত্যটাকে আমি এখনও উল্লেখ করিনি। জনমনে প্রায়শই জাগে এমন একটা প্রশ্নের মাধ্যমে প্রসঙ্গটায় আসা যাক। তাতে এই মহাসত্যটা জানবার জন্য মনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কৌতূহলটুকু সৃষ্টি হবে। মানবমন মাত্রেই—বিশেষত যারা বিশ্বাসী তাদের কথা বলছি—প্রশ্ন তোলে, গোপনে বা প্রকাশ্যেঃ আল্লাহ্ তো এত সখ ক'রে মানব সৃষ্টি করলেন; কিন্তু সামান্য বুদ্ধির ভুলের কারণে সেই মানুষ যখন পাপ করে, তখন তিনি সেই সখের সৃষ্টিকে শাস্তি দিতে বা আগুনে পোড়াতে কি কষ্ট পান না? তিনি সেকাজ পারেন কিভাবে?

www.pathagar.com

নাস্তিক এবং গাফেল (অলস) লোকেরা এই প্রশ্নটাকে রীতিমতো একটা দৃষ্টিভঙ্গি বা ফিলোসফিতে রূপান্তরিত ক'রে দম্ভভরে মন্তব্য ক'রে বসে: তাঁর রূহ্ তিনি পোড়াবেন, তাতে আমার কী?

কিন্তু এবার জেনে নিন প্রশ্নটার সঠিক জবাব। ***আল্লাহ্ অপরাধীকে শাস্তি দেবেন বা আগুনে পোড়াবেন তাঁর দয়া দ্বারাই।***

তাঁর দয়াই কঠোর শাস্তিতে রূপান্তরিত হয়—শুধু ইহকালে নয়, পরকালেও। তাঁর ইহকালে প্রকাশিত দয়াই পরকালের তীব্র আগুন ও যন্ত্রণায় রূপলাভ করে। তা কল্পনা নয়, বাস্তব। তিনি মৃত্যুর সময়ে বা কেয়ামতের সময়ে আমাদেরকে উৎসের দিকে অর্থাৎ তাঁর নিজের আশ্রয়ের দিকে আকর্ষণ করবেন **দয়া** দ্বারাই, অন্য কিছু দ্বারা নয়:

যেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেস্তাগণকে নামিয়ে দেয়া হবে, সেদিনই প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে ***দয়াময়ের*** এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য সেদিন হবে কঠিন।

(সূরাঃ ফোরকান, ২৫-২৬)

ব্যাপারটা সেই মায়ের মতো যিনি তার রোগ-ক্লিষ্ট সন্তানের খেলার মাঠ থেকে ফিরে আসার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে আঁচল প্রসারিত ক'রে ব'সে আছেন; সন্তান ধূলিমলিন ঘর্মাক্ত হয়ে ঘরে ফিরলে তিনি স্নেহের আঁচলে তার মুখখানা মুছে দেবেন, ললাটে এঁকে দেবেন দরদ-ভরা চুম্বন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তারও চেয়ে বেশী ভালোবাসেন যতটুকু ভালোবাসেন একজন মা তার সন্তানকে। একথা রসূল (সঃ) ই বলেছেন। তিনি কেয়ামতের দিনে তাঁর দয়ার সবটুকু উজাড় ক'রে দেবেন মানুষের জন্য। কিন্তু তাঁর দয়াই তাদের জন্য আগুনে রূপান্তরিত হবে যারা জীবদ্দশাতে তাঁর কথামতো চলেনি; এবং তাই-ই তাদের জন্য বেহেস্ত হবে যারা তাঁর কথামতো চলেছে:

দয়া করাকে তিনি তাঁর **কর্তব্য** হিসেবে স্থির করেছেন। কেয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে [সেই দয়ার আকর্ষণ দ্বারাই] একত্র করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারাই অবিশ্বাস করবে যারা **নিজেদেরক হারিয়ে ফেলেছে** [অর্থাৎ তাদের জন্য সেই দয়াই হবে ধ্বংসাত্মক]।

(সূরাঃ আন'আম, ১২)

www.pathagar.com

ঘি-এর কথা ভাবুনতো। ঘি—আহ, কত সুন্দর জিনিস! অথচ তা আপনার পেটে সইলেও কুকুরের পেটে সয় না। কুকুরের জন্য তা বিষ বটে, যদিও যাদের শরীরে প্রয়োজনীয় স্নেহপদার্থের এবং অন্যান্য পুষ্টির অভাব আছে তাদের কাছে তা অমৃত। এখানে দোষ কার?—ঘি এর নাকি কুকুরের পেটের?

এখন আসা যাক একেবারে মহাসত্যের গোঁড়ায়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আল্লাহ গোটা সৃষ্টি জগৎকে একদিন চুরমার ক'রে দেবেন। সেই দিনটি হবে একটি ভয়ংকর দিন—পৃথিবীর ইতিহাসের ভয়াবহতম দিন। কোরআনের বর্ণনাগুলো পড়লে গাঁয়ে কাঁটা দেয়:

কল্যাণবাহী বায়ুর শপথ এবং প্রলয়ংকারী ঝড়ের শপথ, মেঘ সঞ্চালনকারী বায়ুর শপথ, এবং মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর শপথ, শপথ বায়ুর যা মানুষের অন্তরে [ত্রাস ও আশা সৃষ্টি করার মাধ্যমে] উপদেশ পৌঁছে দেয়—যেন ওজর আপত্তির অবকাশ না থাকে এবং তোমরা সতর্ক হও। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী। যখন নক্ষত্ররাজির আলো নিভে যাবে, যখন আকাশ চৌচির হয়ে যাবে, এবং পর্বতমালা উৎপাটিত ও বিক্ষিপ্ত হবে, এবং রসূলগণের উপস্থিতির সময় নিরূপণ করা হবে: এ সবকিছু স্থগিত ক'রে রাখা হয়েছে কোন দিনের জন্য? বিচার দিনের জন্য। (সূরাঃ মুরসালাত, ১ - ১৩)

সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর। এবং পর্বতসমূহ হবে রঙিন পশমের মতো। —এ তো লেলিহান অগ্নি। যা চামড়া ঝলসিয়ে গা থেকে খসিয়ে দেবে।

(সূরাঃ মায়া'রেজ, ৮ - ১৬)

সূর্য যখন নিভে যাবে, যখন নক্ষত্র খ'সে পড়বে, পর্বতসমূহ যখন অপসারিত হবে, যখন গর্ভবতী উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে (তার দুধ ও বাচ্চা কে কেয়ামতের ভয়ে ত্যাগ করা হবে), যখন বন্য পশুর একত্র সমাবেশ হবে, সমুদ্র যখন স্ফীত হবে, দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হবে।

(সূরাঃ তাকভীর, ১ - ৭)

আমরা দেখলাম যে আল্লাহ্ আমাদের মৃত্যু ঘটাবেন আমাদেরকে তাঁর সান্নিধ্যে আকর্ষণ করার মাধ্যমে। এই

www.pathagar.com

আকর্ষণ প্রেমেরই আকর্ষণ—যদিও কারো জন্য তা আকর্ষণ আর কারো জন্য তা বিকর্ষণস্বরূপ, ঠিক যেমন পক্ষপাতিত্বহীন আইন মজলুমের জন্য ভরসা কিন্তু জালিমের জন্য ধ্বংসস্বরূপ। এখন প্রশ্ন হলো: বাহ্যিক বস্তুজগতের ধ্বংস তিনি কী দিয়ে ঘটাবেন?

এবারও একই জবাব—প্রেম দিয়ে। সৃষ্ট জগৎ হলো আইনস্টাইনের আপেক্ষিক বা রিলেটিভ বাস্তবতার জগৎ। এখানে বাস্তবতার রূপকে দর্শকের দৃষ্টি অনুসারে বিভিন্ন রকম ব'লে মনে হয়। এখানে সবার আমিত্ব বাহ্যিকতাপ্রাপ্ত (externalized), ফলে সবকিছুর মূল যে এক তা কেউ সহজে বুঝতে পারে না। কেউ কেউ বুঝতে পারলেও অনুভব করতে পারে না। কেউ কেউ কিছুটা অনুভব করতে পারলেও তা মেনে নিয়ে সার্বিকতার ঐক্যের (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তাওহীদের) বিধান অনুযায়ী আচরণ করতে পারে না। ফলতঃ অস্তিত্বের সম্পর্কে প্রত্যেকের অনুভূতি বা বোধ থাকে ছাড়া-ছাড়া, বিচ্ছিন্নতাবাদী। কিন্তু পরকালের বাস্তবতা মায়ামুক্ত। তাতে সার্বিকতার ঐক্যের দিকটা হবে প্রকাশিত এবং অনড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকের আমিত্বের ব্যক্তিগত দিকটা থাকবে ভেতরমুখী এবং গোপন, যা এখানে বহির্মুখী। সেই বাস্তবতায় থাকবে না কোনো মাত্রাঘাটতি। আল্লাহ্ তাঁর সমন্বয়কারী পবিত্র আরশকে যখন দৃশ্যমান আকাশে নামিয়ে আনবেন, তখন তার আকর্ষণে চুরমার হয়ে যাবে সব ক্ষণস্থায়িত্ব:

তারা কি অপেক্ষা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আল্লাহ্ মেঘের আবরণ নিয়ে এসে উপস্থিত হন, এবং ফেরেস্তাদেরকে নিয়ে, এবং সেভাবে বিষয়টা মীমাংসা হয়ে যায়?

(সূরাঃ বাকারা, ২১০)

পৃথিবী যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে, এবং যখন তোমার প্রতিপালক ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেস্তাগণ উপস্থিত হবে।

(সূরাঃ ফাজর, ২১ - ২২)

এ হলো পূর্ণাঙ্গতার দ্বারা অংশকে নিবিড় আকর্ষণ। স্থায়িত্ব দ্বারা অস্থায়িত্বকে যাচাই। বস্তুজগতের অস্তিত্বের পেছনে সর্বদাই একটা ঐক্য থাকে এবং থাকবে। আমরা তাকে তার সার্বিকতায় আবিষ্কার করতে ব্যর্থ আমাদের মন ও

www.pathagar.com

দৃষ্টির খণ্ডত্ব ও মায়ার কারণে। কেয়ামতের দিন চোখ ও মনের এই মায়াময় অস্থায়িত্ব সেই মহান স্থায়িত্ব দ্বারা আকৃষ্ট হবে। তখন সবাই পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতার প্রতি উন্মুক্ত হয়ে পড়বে।

যারা জীবদ্দশাতে না দেখেই বিশ্বাস করেছিলেন এবং সার্বিকতার ঐক্যের বিধান অনুযায়ী আচরণ করেছিল, তারা তখন দেখবে যে তারা খণ্ডত্বকে অতিক্রম ক'রে স্থায়িত্বে উন্নীত হলো। অপরপক্ষে যারা জীবদ্দশায় নিজের আশা-আকাঙ্খাকে প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছে-তাই আচরণ করছে, তারা নিজেদের খণ্ডত্বের বৃত্তে আটকে গিয়ে দলে দলে ভাগ হয়ে পড়বে:

যে দিন কেয়ামত হবে সেদিন মানুষ (দলে দলে) বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরাঃ রূম, ১৪)

পরকালের বাস্তবতা পূর্ণাঙ্গ ব'লে সেখানে বর্তমানের সব খণ্ডত্ব পূর্ণাঙ্গ বৃত্তরূপ ধারণ করবে, যা থেকে আর বের হয়ে আসার পথ থাকবে না, ঠিক যেমন ইহকালে যাদের মন বেঁকে গেছে তারা তাদের বক্রতার অন্ধকূপ থেকে বের হয়ে আসতে পারে না।

যখনই ওরা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনই ওদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

(সূরাঃ সিজদাহ, ২০)

কারণ তাদের সত্তা ও কর্মফল মিলে একটি পূর্ণ বৃত্ত বা শৃঙ্খল রচিত হবে যা থেকে তারা কখনও বের হতে পারবে না। ব্যাপারটি ঠিক যেন একটা black hole বা কৃষ্ণবিবর, যার মধ্যকার আলোও তার বলয় থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না।

ফেরেস্তাদের বলা হবে:

'ধর ওকে, গলদেশে (ওরই কর্মফলের) বেড়ি পরিয়ে দাও এবং নিক্ষেপ কর জাহান্নামে; পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে; সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না'। (সূরাঃ হাক্কাহ, ৩০ - ৩৩)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ অনেক আয়াতে বলেছেন যে, "জাহান্নামীরা চেষ্টা ক'রেও তা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না"।

এ হলো পারলৌকিক বাস্তবতার আধ্যাত্মিক স্তরের ব্যখ্যা। বাইরে ঠিক তাই ঘটবে যেমনটি বলা হয়েছে পাক কোরআনে। তবে ইহকালের এই বাহ্যিকতার সাথে সেই বাহ্যিকতার পার্থক্য এই যে সেখানে সবাই তাদের উৎসের রহস্য জানবে, ধ্বংসের কারণ জানবে, তাঁর সাথে মিলিত হতে পারুক বা না পারুক, যা এখানে তারা জানে না বা যারা অবিশ্বাসী বা নামে মাত্র বিশ্বাসী।

যা হোক, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর দয়ার পূর্ণাঙ্গতার আকর্ষণে সবকিছুকে একাকার ক'রে দেবেন। ঠিক এই ঘটনাই ঘটে প্রতিটি ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ে। এ কারণে প্রত্যেকের মৃত্যুই তার জন্য কেয়ামতস্বরূপ। মৃত্যুর সময়ে ব্যক্তি দেখতে পায় যে, বাস্তবতা পূর্ণাঙ্গই ছিল এবং পূর্ণাঙ্গই আছে—শুধু সে তাকে দেখতে পেত না, চোখ ও মনের মায়ার কারণে। সঠিক পথে যারা সাধনা করেন তারাও মৃত্যুর আগে মৃত্যুবরণের মাধ্যমে সেই পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতার সাক্ষাৎ পান। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ দয়াময় সবকিছুকে তাঁর দয়া দ্বারাই আকর্ষণ করবেন, অন্য কোনো কঠোরতা দ্বারা নয়ঃ

ওরা আল্লাহ্কে যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে ও আকাশগুলো গুটিয়ে থাকবে তাঁর ***ডান হাতে***। পবিত্র, মহান তিনি। ওরা যাকে শরিক করে তিনি তার উর্দ্ধে। (সূরাঃ জুমার, ৬৭)

রসূল (সঃ) প্রার্থনা করতেন—হে আল্লাহ্! আমি তোমার বাম হাতের কাছ থেকে তোমার ডান হাতের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার কাছ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।—এখানে তাঁর বাম হাত হলো তাঁর কঠোরতার হাত, আর তাঁর ডান হাত হলো তাঁর দয়ার হাত। উপরের আয়াতটিতে আমরা তো দেখলামই যে কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তাঁর দয়ার হাতের মুঠোতেই বিশ্বজগৎকে পুরে নেবেন। অথচ তাঁরই অন্য নাম হবে ধ্বংসযজ্ঞ, তবে তাদের জন্য নয় যারা আত্মসমর্পণকারীঃ

www.pathagar.com

যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আল্লাহ্ যাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করতে চাইবেন না, তারা ছাড়া আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবাই-ই ভীতি বিহবল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর কাছে লাঞ্ছিত অবস্থায় আসবে। (সূরাঃ নমল, ৮৭)

প্রিয় পাঠক। আল্লাহ্র দয়া আসলেই মারাত্মক কিনা সে বিষয়ে এখন ভাববার সময় এসেছে। 'নামায পড়ব—আরে ভাই, এত ব্যস্ততা, পেরে উঠি না। আল্লাহ্ তো গফুরুর রহীম। বয়স হোক।' এই ডায়ালগে কাজ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এভাবে দিন যত যেতে থাকবে তত এক পর্যায়ের পর মনে হতে থাকবে যে বিশ্বাস আর অবিশ্বাস একই কথা, মন ভালো থাকলেই চলে।

বুদ্ধিমানেরা আল্লাহ্র দয়াকেই ভয় করে। আল্লাহ্ তাঁর কঠোরতার দ্বারা শুধু পাপীকে শাস্তি দেন, কিন্তু তিনি তাঁর দয়া দ্বারা পূণ্যবানকেও পাপের দিকে ঠেলে দেন। সুতরাং তাঁর কঠোরতার চেয়ে তাঁর দয়াই মারাত্মক। আমি এত পাপ ক'রেও শাস্তি পাচ্ছি না, টিকে আছি—এই ভ্রান্ত ধারণা যেন কাউকে ধ্বংস না করে । আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন যে তিনি এভাবেই মানুষকে বিভ্রান্ত করেন।

সূরা ইয়াসিনের প্রথম দিকের একটি আয়াতের কথাই বিবেচনা করুনঃ

তুমি কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে ***দয়াময়*** আল্লাহ্কে ***ভয় করে***।

(সূরাঃ ইয়াসিন, ১১)

কেউ কি কখনও আয়াতটিকে নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছে? যিনি ***দয়াময়*** তাঁকে আবার ***ভয়*** পাবার দরকারটা কী? এ এক রহস্যময় উক্তি। স্বয়ং দয়াময়ই বলছেন—*আমি দয়াময় ব'লেই আমাকে ভয় করতে হবে*। সাবধান! আমি এত দয়ালু যে আমি লাই দিয়ে দিয়ে তোমাকে মাথায় তুলব।

এর পরেও কি আমাদের আল্লাহ্কে ভয় পাবার সময় আসেনি? দয়াময়ের দয়াই যদি সকল কষ্টের উৎস হয়, তাহলে আর আশ্রয় কোথায়, তাঁর কাছে ছাড়া? যারা পান খেতে খেতে ভুড়িতে হাত বুলিয়ে ঘোষণা করছি যে আল্লাহ্ দয়াময় এবং দয়াময়ের পথে চলছি না, দয়াময়ের দয়ার রহস্য সম্বন্ধে তাদেরকে একটু ভালোভাবে জানতে হবে।

www.pathagar.com

আমরা প্রচণ্ড দয়ালু ব'লে আজ সমাজে এত সন্ত্রাস-অরাজকতা। আমরা একটু কঠোর হলে মুষ্টিমেয় কিছু লোক আজ-গোটা সমাজটাকে জিম্মি ক'রে ফেলতে পারত না। অবশ্য যারা নিজের নফ্সের প্রতি কঠোর নয়, তারা বাইরের পৃথিবীর প্রতি সঠিক উপায়ে কঠোর হতে পারে না, বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলে। তাতেও ঘটে অরাজকতা। মৌলবাদ এই কারণে ঝামেলার সৃষ্টি করে।

প্রিয় পাঠক, পূর্ণাঙ্গ তওবা না করলে দয়াময়ের দয়াই তাঁর কাছে যাবার পথ বন্ধ ক'রে দেবে। ছিচকে চোরের মতো তওবা নয়, চিরতরে তওবা। যা করেছি ভুল করেছি, এবং যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। আল্লাহ্‌র দয়া থেকে সাবধান! ■

www.pathagar.com

বার. দুঃখের দান

লাইব্রেরিতে ব'সে বুড্ডা শুষ্ককণ্ঠে গুরুকে তাঁর নীরবতাকে ভেঙ্গে দিয়ে প্রশ্ন করল—'স্যার, জীবনটা ভালো লাগে না। আর পারছি না। আবার যা ভালো লাগে না তা কিভাবে ত্যাগ করতে হয় তাও জানি না। মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'ত্যাগ না ক'রে ম'রেও শান্তি পাবে না। যা ত্যাগ করতে পারনি, দেখবে যে তা তোমার সাথেই আছে।'

'এখন কী করা?'

'আগে গ্রহণ কর। তারপর ত্যাগ কর। আম ছালা দুটোই ত্যাগের বস্তু। তুমি আম ত্যাগ ক'রে ছালা নিয়ে কোথায় যাবে?'

বুড্ডা গুরুর দিকে তাকিয়ে রইল। গুরু কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন:

দুঃখের উপকারিতা

১.

সংসারে যে আনন্দ পায়
তার অন্তরে ব্যাধি আছে
সুতরাং মুক্তির প্রথম শর্ত হলো
নিরানন্দ এবং কোনো কিছুতে মন না বসা
অথচ তা অযোগ্যতা বা অলসতাও নয়
এ হলো মন কী চায় তা না জানার পুরস্কার
এবং তার ঘরে ফিরতে না পারার অস্থিরতা

তোমার মন কোথাও বসেনি
এর অর্থই হলো সে কোথাও শোয়নি
এবং ফলে সে ঘুমাতে পারছে না
সকল পিছুটানকে সে হারিয়ে দিয়ে এখন হাফাচ্ছে
ওকে এক গ্লাস শরবত পান করানোর আগে
একটা মরুভূমি পার করাতে হবে
ওকে এখন তাই বেশি বেশি দিতে থাক
যা ওর ভালো লাগে না

www.pathagar.com

ক্লান্তির পর বিরক্তির পর ক্লান্তির পর বিরক্তি
এসব ওষুধ মাত্রাতিরিক্তভাবে সেবনের পর
ওর রোগটা জেগে উঠবে ভেতর থেকে
সে যখন জানবে যে সে রোগগ্রস্ত
তখন তার রোগ যাবে সেরে
সেই ব্যাধিই মনের জন্য ধ্বংসাত্মক
যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে সচেতন নয়
যে রোগ তার চোখে ধরা প'ড়ে যায়
তা তৎক্ষণাৎ ওষুধে রূপান্তরিত হয়
এবং বিনাশ করতে থাকে অন্যান্য রোগগুলোকে
মনের রোগীর উপরে মনের গবেষক
আর নেই—যদি রোগী জানতে পারে
কী তার রোগ

আমি রোগগ্রস্ত মন ভালোবাসি
আমি তা কিনে নেই উচ্চমূল্য দিয়ে
কারণ একটা মন বিলুপ্ত হলে পর
মহাকাশে এক লক্ষ কোটি গ্যালাক্সির জন্ম হয়

তোমার যা ভালো লাগে না
তা তোমাকে জ্ঞানী ক'রে তুলুক
তোমাকে যা আকর্ষণ করে না
তা তোমাকে জ্ঞানী করে তুলুক
তোমার তৃষ্ণার কাছে যার ক্ষুদ্রত্ব ধরা প'ড়ে যায়
তুমি তা বিনা মুনাফায় বিক্রি করছ না কেন?

আনন্দ দেবার ক্ষেত্রে দেহের ক্ষমতার সীমা
তোমাকে হতাশ করুক
হতাশা দেহের ওজন কমায়
আশা আকাঙ্খার বোঝা নিয়ে
হালকা বিছানায় ঘুমাতে নেই
মানুষের দেহের চেয়ে তার মনের ওজন বেশি
এ কারণে যে লোকটাকে উঁচু ক'রে ছুড়ে মারতে
তেমন বেগ পেতে হয় না,
তাকে ঘুম পাড়াতে গেলে তার চেয়ে খরচ বেশি হয়
পৃথিবীতে ঘুমের উপলক্ষ্যে অনেক
অর্থ অপচয় হচ্ছে ইদানিং
আসলে ঘুমাবার আগে মাথাটাকে

www.pathagar.com

সিন্দুকে আটকে রাখার অভ্যেস করা ভালো
শুধু চোখ বুজলেই মাথা হালকা হয়ে যায় না
মাথার মলমের অভ্যেস ত্যাগ ক'রে
বুক মালিশ করলেই বরং ভালো ফল পাওয়া যাবে

তোমার এখন মন ভালো নেই—
এটাই প্রমাণ করে যে এখন তোমার মন যেখানে আছে
তা তার লক্ষ্য নয়।
সুতরাং কিছু পেলে সে খুশি হতো।
এখন যেপথে চলতে পারলে সে আনন্দ পেত
সেপথ তার জন্য ভয়ংকর।
সুতরাং তাকে সে পথেই চালাও
যে-পথে সে চলতে আনন্দ পায় না।
কারণ তারই প্রান্তে রয়েছে গন্তব্য
যেখানে মন যা চাবে তা পাবে এমনটি নয়
বরং সেখানে সে এত আনন্দিত হবে যে
সে কোনোকিছু চাওয়ার কথাই ভুলে যাবে।

২.

হারাম হালাল বেছে খুটে গ্রহণ করতে করতে
আমরা বড় বেশি হেসেবি হয়ে গেছি
ফলত আমরা সুখ-দুঃখকেও বেছে বেছে
গ্রহণ-বর্জন করার ক্ষেত্রে বেশ দক্ষতা দেখাচ্ছি
সুখকে পূজো ক'রে যে জীবন ক্লান্ত হয়ে পড়ে
তা টলতে টলতে ঢ'লে পড়ে দুঃখের ডাস্টবিনের পাশে

যে যা ত্যাগ করবে—সে তা পাবে
যে যা দান করবে—সে তা পাবে
এরই নাম সুদে-আসলে প্রাপ্তি এবং বরকত
যে দুঃখ ত্যাগ করবে—সে তা বহুগুণে বেশি বেশি পাবে
এবং যে অপরকে দুঃখ দান করবে—
সে সুদে আসলে ফেরত পাবে দুঃখ
দুঃখকে হারাম আর সুখকে হালাল ভেবে
আমরা অনেকেই নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেছি
ফলে আমাদের ব্যবসা ভালো হচ্ছে না
মনে রাখা দরকার যে
ভালো মন্দের বিচার চলে বস্তুর ক্ষেত্রে
মনোভাবের ও অনুভূতির ক্ষেত্রে দুঃখকে ভালো এবং

www.pathagar.com

সুখকে মন্দ বললেই লাভ
তাহলে একদিন পার হয়ে যাওয়া যাবে
সুখ-দুঃখের সম্মিলিত অক্রমণ—
যোগ-বিয়োগের নামতা গোণার
আগে খুশি হতে পারা একটা বড় যোগ্যতা
তা সবার ভাগ্যে লেখা নেই

অন্ধকার যদি না থাকত
তাহলে আলো কাকে আলোকিত করত?
আলো যদি না থাকত
তাহলে অন্ধকারে স্বপ্ন দেখতাম কিভাবে

মানুষ আলোয় ভয় পেলে চোখ বন্ধ করে
অথচ অন্ধকারে ভয় পেলে বেশি ক'রে খুলে রাখে চোখ
একটা শিশুকে ১২ ঘণ্টা ব্যবধানে ভয় দিয়ে
এই রহস্য শিখে নেয়া ভালো
যখন ভয় পেলে খুলে যায় চোখ
তখন ভয় পাওয়া স্বাস্থ্যের লক্ষণঃ
দুঃখের মুহূর্তের অসহায়ত্বপূর্ণ ভয়
অন্তরে আলোর তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয়
অপরপক্ষে যখন ভয় পেলে ছোট হয়ে যায় চোখ
তখন চোখে মলম লাগানো ভালোঃ
সুখের মুহূর্তে সুখ হারাবার ভয়
কাউকে বিনয়ী আর কাউকে সঞ্চয়ী ক'রে দেয়
সুখের নানান অবস্থা
সুতরাং তাওহীদ শেখা দরকার অন্ধকারে
দুঃখের ঋতুতে
ঠিক যেমন অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে
পড়া হয় তাহাজ্জুদ নামাজ
সুযোগ থাকতে প্রাণ ভ'রে আলিঙ্গণ কর দুঃখকে
কারণ দুঃখ বেশিদিন থাকে না
সুযোগ অত্যন্ত সীমিত
আগে-এলে-আগে-পাবে ভিত্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়
দুঃখের স্টক শেষ হয়ে গেলে
হারাতে হবে সুবর্ণ সুযোগ

www.pathagar.com

তের. নাম বদল

রাতে খাবার টেবিলে ব'সে ছায়া বাবাকে প্রশ্ন করল—'আব্বু, তুমি আমার নাম ছায়া রেখেছিলে কেন?'

প্রফেসর মেয়ের দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পড়লেন। মেয়ের বিষণ্ন মুখ দেখে তিনি চিন্তিতও হলেন। কিন্তু এ প্রশ্নের কী জবাব দেবেন তা তিনি ভেবে পেলেন না। তাছাড়া প্রশ্নটির আদৌ কোনো জবাব দরকার কিনা তিনি খাবার চিবোনোর ফাঁকে ফাঁকে এই চিন্তা করতে লাগলেন।

'আমার নামের আইডিয়াটা কি তুমি গাছের কল্পনা থেকে পেয়েছিলে?'

প্রফেসর অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'গাছের যেমন ছায়া হয়, তার তো তেমনি ফুলও হয়, তাই না আব্বু?'

প্রফেসর মাথা ঝাঁকালেন।

'তাহলে আমাকে একটা ফুলের নাম দাওনি কেন? ... আমার ... আমার নামটা তো সূর্যমুখী হতে পারত।'

ছায়া আর কিছু বলতে পারল না। তার চোখভরা অশ্রু। সে জোর ক'রে অশ্রু-মিশ্রিত ভাত মাথা নিচু করে খাচ্ছে, তার বাবা-মা নির্বাক দর্শকের মতো তাকিয়ে আছেন তার প্রতিটি গ্রাস ভাতের দিকে।

www.pathagar.com

চৌদ্দ. সূর্যের ছায়া

সকালে গুরু এসে বুড্ডাকে বললেন—আমার এখানে লং কোর্সের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি আধ্যাত্মিকতার শর্ট কোর্সের আয়োজন ক'রে থাকি। এখানে প্রথম তিন দিনের মধ্যে যদি কেউ আউট হয়ে না যায় তাহলে তাকে আমি আরেকটা উচ্চতর শর্ট কোর্সের সুযোগ দেই। তুমি আপাতত আউট।

দিন দশেক বনে-জঙ্গলে-পথে-প্রান্তরে ঘুরে আবারও এস। যদি দেখি এই কোর্সের ম্যাটেরিয়ালটা হজম করতে পেরেছ, তাহলে তোমাকে আমি 'ধর্মের সন্দেহতত্ত্ব' শেখাব।'

'ধর্মের সন্দেহতত্ত্ব?'

'হ্যাঁ। আমি ধর্মের মনস্তত্ত্বকে বলি ধর্মের সন্দেহতত্ত্ব। এ এক মহাবিদ্যা। সবার মাথায় এ সয় না। অনেক মাথা ডিমের মতো ফেটে যায়। এ সবার জানার দরকারও নেই। তোমার মাথা এখনও ভাঙ্গেনি দেখে ভাবলাম বোঝাটা তোমার মাথায়ই চাপানো যায়।'

'স্যার, আমাকে সাস্‌পেন্‌ড করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

'দুশ্চিন্তা ক'র না। পরের বার একেবারে তাড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করব। এই নাও কিছু টাকা। ফিরে আসতে চাও ব'লে দিলাম।'

প্রফেসর ভার্সিটিতে ক্লাশ নিতে চ'লে গেলেন। বুড্ডা তার ঘরে ফিরে ব্যাগ গুছিয়ে নিল। টেবিলের ওপর রাখা ধ্যানের স্ক্রিপটি তুলে নিতে গিয়ে দেখে যে তার ওপর একটি তাজা সূর্যমুখী ফুল রাখা আছে। ফুলটির ডাঁটাটি একটি নীল কাগজে মোড়ানো। তাতে হলুদ কালি দিয়ে লেখা আছেঃ

> আজ সকালে আকাশে একটামাত্র সূর্য উঠেছিল।
> তার দিকে প্রথম দৃষ্টি ফেলেছিল একটামাত্র ফুল।
> চোখ ফেরানোর আগেই ওকে তুলে নিলাম।
> এখনও ওর মুখে সূর্যের রং। ওর যদি কোনো ছায়া
> পড়ে, নিশ্চয়ই তা সূর্যেরই ছায়া।

www.pathagar.com

বুড্ডা সূর্যমুখী ফুলটি তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। দশটি দিন কোনোভাবে ঘুমিয়ে কাটানো যাবে কি না এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে সে রাজধানীর ফুটপাত বেয়ে হাঁটতে লাগল। ■

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত (চলবে)।

www.pathagar.com

www.pathagar.com